ভারতের নানান ভাষার

প্রবাদ

সাত পাকের সতেরো ফ্যাঁকড়া

অঞ্জনাভ দত্ত

বিশ্বজ্ঞান

৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ এপ্রিল ২০০০

প্রকাশক ঃ
দেবকুমার বসু, বিশ্বজ্ঞান।
৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ অঞ্জনাভ দত্ত

অক্ষর বিন্যাস ঃ
রীডার্স কর্ণার
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ
ঝর্ণা প্রিন্টার্স
১৬ বৃন্দাবন মল্লিক ফাস্ট লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ অঞ্জনাভ দত্ত

আমার সেজোদাদা প্রয়াত ওরিগ্যামি-শিল্পী
অমলাভ দত্তর স্মৃতির উদ্দেশে, প্রবাদ
সম্পর্কে যাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল।

গোড়ার কথা

এটা শুনেছিলাম এক তামিল বন্ধুর কাছে। সে-সময় এক প্রাক্তন ক্রিকেটার টিভির ধারাভাষ্যে তাঁর মাতৃভাষার প্রবাদ ইংরেজিতে শুনিয়ে বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় প্রবাদ নিয়ে ইংরেজি-নবিশদের মধ্যেও বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। একবার একটি লেডিজ্ ক্লাবের কিটি পার্টিতে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে নিজের নিজের মাতৃভাষার প্রবাদ ইংরেজিতে শোনাতে হয়েছিল। আমাদের বন্ধুটির স্ত্রীও একজন প্রতিযোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বলা প্রথম প্রবাদটির জন্যই তিনি খারিজ হয়ে যান। এক বিচারকের মতে সেটা নাকি তামিল নয়, হিন্দি প্রবাদ ছিল।

তখনই আঁচ করেছিলাম আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে। যখন প্রবাদটা শুনলাম বেশ একচোট হাসলাম। কেননা ওই একই প্রবাদ শুধু তামিল[১] আর হিন্দিতেই[২,৩] নয়, বাংলাতেও আছে।

"মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ট্যাঁক পানে।"

পরে দেখেছি এটা অসমিয়া[৪], তেলুগু[৫], মারাঠি[৬] এবং খানিকটা অন্য চেহারা নিয়ে গুজরাতি[৭] ও কাশ্মীরিতেও[৮] আছে। আবার, বাংলায় যেমন মা মরলে বাপ 'তালুই' হয় মারাঠিতে হয় 'মেসো'[৯] ও পাঠান্তরে 'অতিথি'[১০] এবং কন্নড়ে[১১] ও তামিলে[১২] 'কাকা'। আমাদের আরেকটা প্রবাদে[১৩] যে আছে কোনও একটা জিনিস শাশুড়ির বদলে বউ ভাঙলেই সেটাকে বড়ো করে দেখা হয়, তার তামিল[১৪,১৫], মলয়ালম[১৬] ও কন্নড়[১৭] সংস্করণ খুবই জনপ্রিয়। হিন্দি 'সাস ভী কভী বহূ থী' তামিল[১৮] ও তেলুগুতেও[১৯] আছে। সবচেয়ে মজার কথা, আমরা যে ছেলেবেলায় রোদ-বৃষ্টি একসঙ্গে দেখলেই বলতাম "জল পড়ছে, রোদ উঠছে, শেয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে" সেটা তেলুগুতেও[১৯*] আছে।

আসলে প্রত্যেক ভাষাতেই এমন অজস্র প্রবাদ আছে যা অন্যান্য ভাষাতেও পাওয়া যায়। একে তো একই কথা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মাথায় আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তার ওপর বণিকেরা যে পণ্যদ্রব্যের পাশাপাশি সংস্কৃতিরও আদান-প্রদান করে আসছেন। ভারতীয় গল্পগুলোই যে আরব্য রজনীতে গিয়ে জড়ো হয়েছিল সে তো ওঁদেরই কল্যাণে। তা ছাড়া, কিছু প্রবাদ সংস্কৃত থেকে নানান ভাষায় সরাসরি ঢুকে পড়েছিল বলেও এই মিলটি পাওয়া যায়। তাই নিজেদের ভাষার কোনও প্রবাদ নিয়ে অন্য কোনও ভাষার মানুষের কাছে জাঁক করার বেশ বিপদ আছে।

ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রবাদ সম্পর্কে কৌতূহলের মূলে খানিকটা ছিল আমার পেশা। একসময় আমি ছিলাম ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশনের শব্দযন্ত্রী। আমাদের অন্যতম কাজ ছিল সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তথ্যচিত্রের শুটিং করা। সে সময় একটা নেশা ধরে যায় নানান অঞ্চলের প্রবাদ সংগ্রহ করার। তবে পনেরো বছর পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায় ফিল্মস্ ডিভিশনেই আমি পেশা পরিবর্তন করার ফলে। যদিও কৈশোর থেকে আমি মুম্বই-প্রবাসী, আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের পোকা। কিছু লেখালেখিও করেছি।

দুটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হওয়ার ফলে আমার উপরওয়ালারা আমায় একটা আধ লেখক বলেই ভাবতেন, তাই খানিকটা নজিরবিহীন ভাবেই ও খানে পাঁচ বছরের জন্য তথ্যচিত্রের বাংলা ভাষ্য রচয়িতা হয়ে যাই এবং তারপর এক সময় চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞাপন জগতে বাংলা কপিরাইটার হিসেবে যোগ দিই।

শেষ দুটি পেশায় আমার এক বিরাট লাভ এই হয় যে, আমি সহকর্মী হিসেবে পাই ভারতের সমস্ত প্রধান ভাষার কিছু কলমজীবীকে এবং হাতে আসে নানান ভাষার প্রবাদের সংকলন। স্বভাবতই কৌতূহল হয় আমার সংগ্রহ করা প্রবাদগুলো সংকলনে আছে কিনা তা জানার। খুঁজতে খুঁজতেই এক সময় ভারতের নানান ভাষার প্রবাদের প্রেমে পড়ে যাই এবং সেগুলোকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে শুরু করি।

গ্রামভারত থেকে সরাসরি প্রবাদ সংগ্রহ করার সময় বেশ কয়েকটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রামের লোকেরা হয়তো তাঁদের কথাবার্তায় কিছু প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু অনেকেই আলাদা করে সেগুলোকে প্রবাদ হিসেবে শনাক্ত করতে পারেন না। তাই বহু ক্ষেত্রেই অনেক সাধ্যসাধনা নিষ্ফল হত।

দ্বিতীয়ত, জনপ্রিয় প্রবাদ মানেই যে খুব রসের হবে তা নয়। যদিও আমি বেছে বেছে গাঁযের কবিয়ালদের কাছে গিয়ে দরবার করতাম, তুলে রাখার মতো প্রবাদ পেতাম খুবই কম। বেশির ভাগই নিছক বিবৃতি। যেমন, "মায়ের তুলনা হয় না", "বেশি লোভ করতে নেই", "মানুষ মরণশীল" ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, যদিও বেশির ভাগ উত্তর-ভারতীয় ভাষার মান্য চলিত রূপ কানে শুনে সহজেই দেবনাগরী অক্ষরে লিখে ফেলা যায়, তাদের উপভাষাগুলো নয়। প্রায়শই প্রবাদগুলোর আঞ্চলিক উচ্চারণ থেকে বর্ণগুলোকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যেত না। তাই বেশ কয়েকটি বিভ্রাট ঘটার পর আমার অনেক বেশি নিরাপদ মনে হয়েছিল ওখানেই প্রবাদগুলোকে তাদের নিকটতম মান্য চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়ে নেওয়া।

এটা অবশ্যই এক ত্রুটি। তা সত্ত্বেও যে এগুলোকে এ বইতে শামিল করা হল তা এই ভরসায় যে, কোনও পাঠক মূল প্রবাদগুলোর সন্ধান পেলে আমাদের জানাবেন। অবশ্য অনেকগুলো আমি নিজেই প্রবাদের বইয়ে খুঁজে পেয়েছি এবং তারা এ বইয়ে আসল চেহারা নিয়েই হাজির হয়েছে।

আমার কাছে প্রবাদের আরেকটি উৎস ছিল হিন্দি ছায়াছবি ও ধারাবাহিক। অনেকেই হয়তো নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু ঘটনাটা হল—এগুলোর সংলাপ যাঁরা লেখেন তাঁরা আসেন বিশাল হিন্দি বলয়ের নানান অঞ্চল থেকে এবং সংলাপ রচনায় বহুল পরিমাণে নিজের নিজের অঞ্চলের প্রবাদ হিন্দি মান্য চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে ব্যবহার করে থাকেন। যাঁরা এ পেশায় আসতে চান তাঁরাও পেশার প্রয়োজনেই অনেক প্রবাদ মনে রাখেন—কিছু আমি সরাসরি তাঁদের কাছ থেকেও পেয়েছি। পেয়েছি সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও।

তবে হ্যাঁ, এ বইয়ে তুলে ধরা প্রবাদগুলোর নব্বই ভাগই কোনও না কোনও প্রবাদের সংকলন থেকে নেওয়া (প্রধানত বিশ্বনাথ দিনকর নরওণে সম্পাদিত 'ভারতীয় কহাবত

সংগ্রহ' থেকে) এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া প্রবাদ এ বইটির নেহাতই এক ক্ষুদ্র অংশ। এগুলোকে বিশুদ্ধবাদীরা উপেক্ষা করতে পারেন তালিকায় বিশেষ চিহ্ন দেখে।

ভিন-ভাষার প্রবাদের বাংলা সংস্করণ যে নেহাত আক্ষরিক অনুবাদ হবে না সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই কারও সংশয় নেই, তবুও ভাবানুবাদ সম্পর্কেও কয়েকটা কথা বলা দরকার।

একটা রাজস্থানী প্রবাদ আছে—

রাজা মানৈ জকী রাণী, ঔর ভরৌ পানী।

এটাকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

রাজা যাকে মেনে নিল সে হল রানি,
বাকিরা ভরুক পানি।

এটা শুনলে বাঙালি পাঠকের কানে নেহাতই খেলো ঠেকবে। মনে হবে নেহাত 'রানি'র সঙ্গে মেলাতেই 'পানি' শব্দটাকে আনা হয়েছে। ওঁদের মনোভাব পাল্টে যাবে যদি জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এখানে রাজস্থানের এমন সব এলাকার মেয়েদের কথা বলা হয়েছে যেখানে 'জলকে চলা' মানে মাথার ওপর ঘড়ার পর ঘড়া সাজিয়ে রোজ দল বেঁধে দশ-বিশ মাইল হাঁটা। রানি হওয়া মানে আর কিছুই নয়, বরাত জোরে হঠাৎ কারও নজরে পড়ে বড়লোকের বউ হয়ে গিয়ে এই অমানুষিক পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এবং বাকিদের জীবনের দুর্বিষহতাকে আরও প্রকট করে তোলা।

এরকম অনেক প্রবাদই আছে যাতে কিছু কথা উহ্য থাকায় তাদের আক্ষরিক অনুবাদ থেকে আসল অর্থটা পাওয়া যায় না। আবার সঙ্গে যদি পাদটীকা দেওয়া হয় তাতে রসভঙ্গ ঘটে। তা ছাড়া পাঠকও ক্ষুন্ন হন যেহেতু কথায় বলে, "হোয়েন আ ফুল ইজ্ টোল্ড আ প্রভার্ব, দা মিনিং অফ ইট হ্যাজ্ টু বি এক্সপ্লেন্ড টু হিম।"

কিন্তু প্রবাদগুলো বাংলায় রূপান্তরিত করার সময়ই যদি উহ্য কথাগুলো তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তা হলে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি থাকবে না। যেমন—

রানি হয়ে গেল আঘাটে রাজার
মনে ধরে গেল যাকে;
বাকিরা মরুর কত পথ ভেঙে
কলস বইতে থাকে।

এবার একটা মারাঠি প্রবাদের কথা ধরা যাক।

অঠরা নখী খেটরে রাখী, বীস নখী ঘর রাখী।

এর আক্ষরিক অর্থ হল—

আঠারোটা নখ যার—জুতো সামলায় সে,
কুড়িখানা নখ যার—ঘর সামলায় সে।

এ তো রীতিমতো একটা ধাঁধা। তবে হ্যাঁ, এ কথা যদি জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রথমটা কুকুর আর দ্বিতীয়টা নারী, তা হলেই বোঝা যাবে যে এটা এক ঘোর নারীবিদ্বেষীর কথা যে মনে করে মেয়েদের সঙ্গে কুকুরের তফাত আঠেরো-বিশ।

সুতরাং এখানেও নিশ্চয়ই এই তথ্যটা প্রবাদের মধ্যেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। যেমন—

কুকুরের নখ আঠেরোটা বলে
দোরে সামলায় জুতো,
ঘর সামলায় মেয়েরা কারণ
নখ বেশি আছে দুটো।

আরও একটা মারাঠি প্রবাদের কথা ধরা যাক—

হা সূর্য, হা জয়দ্রথ।

অর্থাৎ—

এটা সূর্য, এটা জয়দ্রথ।

এটা দেখে কারও কারও মনে পড়তেও পারে কীভাবে শ্রীকৃষ্ণ সূর্যাস্তের বিভ্রম সৃষ্টি করে জয়দ্রথবধে সাহায্য করেছিলেন সেই কাহিনি। কিন্তু তাঁরা প্রবাদ হিসেবে লাইনটার তাৎপর্য বুঝতে পারবেন না। এবার ধরুন কেউ ছবি এঁকে কাউকে বোঝাতে চেষ্টা করছে কী দারুণ এক পাসে একটা গোল হয়েছিল। বার বার ব্যর্থ হয়ে সে যদি গোলপোস্টের সামনে দুটো ফুটকি বসিয়ে বলে—"এটা সূর্য আর এটা জয়দ্রথ, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না!' —তা হলে নিশ্চয়ই প্রবাদটার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এরকম বেশ কিছু প্রবাদ আছে যা প্রয়োগ করার আগে-পরে কয়েকটা কথা জুড়ে না দিলে তাদের কোনও অর্থই হয় না। সুতরাং বাংলায় রূপান্তরিত করার সময় সেই অতিরিক্ত কথাগুলো প্রবাদের সঙ্গে জুড়ে দিতে দোষ কী? যেমন—

ওখানে রয়েছে সূর্য আর এখানে জয়দ্রথ—
কিস্‌সাটা এত তরলং জলবৎ।

এবার একটা হিন্দি প্রবাদের কথায় আসা যাক।

সাস কে মরনে পর বহু অগর রোতী,
ৱে আঁসূ হোতে হীরে য়া মোতী।

এর আক্ষরিক অর্থ হল—

শাশুড়িরা মরলে যদি ছেলের বউরা কাঁদত,
হত সেই চোখের জল হিরে কিংবা মুক্তো।

এটা মূল হিন্দি ছড়াটার তুলনায় নেহাতই পানসে নয় কি? কিন্তু যদি একটু বদলে নেওয়া যায়?

শাশুড়ির শোকে কান্না—
দামে তা হিরে কি পান্না।

যদিও প্রবাদের বক্তব্যে যে বুদ্ধির ঝিলিক থাকে প্রধানত সেইটাই আমরা উপভোগ করে থাকি, মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে তার ছন্দমিলের ভূমিকাও কম নয়। যেহেতু বাঙালির কান প্রবাদে ছড়া শুনতেই বেশি অভ্যস্ত, এখানে ভিন-ভাষার প্রবাদের বাংলা সংস্করণগুলোতে

ছন্দমিল আনার প্রয়োজনেই কম-বেশি এদিক-ওদিক করা হয়েছে মূল প্রবাদগুলোর রস অক্ষুন্ন রেখে।

তবে এ কথা আমরা ভুলে যাইনি যে প্রবাদের বিশুদ্ধতার এক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মূল্য রয়েছে যেহেতু প্রবাদ এক একটা অঞ্চলের সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেইজন্য এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি প্রবাদের মূল রূপ বাংলা লিপিতে দেওয়া হল আলাদা করে, যাতে জিজ্ঞাসু পাঠক যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সেগুলোর আক্ষরিক অর্থ জেনে নিতে পারেন।

বিশাল 'হিন্দি' বলয়ের প্রবাদগুলো নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল যে অঞ্চল নির্বিশেষে সবকটির ভাষাকে 'হিন্দি' বলা যাবে কি না। শেষে বিহার ও রাজস্থানের প্রবাদগুলোকে 'বিহারি' ও 'রাজস্থানী' নাম দিয়ে বাকিগুলোকে 'হিন্দি প্রবাদ' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে খানিকটা প্রচলিত অর্থেই।

আর হ্যাঁ, প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোথাও বাংলা প্রবাদের উল্লেখ থাকলেও "ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ"-এর ভূগোল থেকে বাংলাকে সহজবোধ্য কারণেই সরিয়ে রাখা হয়েছে।

বিষয় হিসেবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের চেয়ে উপভোগ্য বোধ হয় আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। সেইসঙ্গে অন্যান্য সম্পর্কের টানাপোড়েনও আমাদের কাছে কৌতূহলের বস্তু। এক একটা বিয়েকে কেন্দ্র করে যেসব নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেমন বর-বউ, শাশুড়ি-বউ, শাশুড়ি-জামাই, ননদ-ভাজ, শালি-ভগ্নীপতি—এগুলোতে আমাদের জন্য প্রচুর রসের উপকরণ থাকে। "ভারতের নানান ভাষার প্রবাদ"-এর প্রথম খণ্ড "সাত পাকের সতেরো ফ্যাঁকড়া"-র বিষয় এইটাই।

মঞ্জুনাভ দত্ত

এক

এক একটা বিয়ে পেকে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান থাকে কন্যাদায়গ্রস্ত মা-বাবাদের। তাদেরই তো 'গলার কাঁটা' নামানোর তাগিদ থাকে সবচেয়ে বেশি। পাত্র জোগাড় করা সর্বত্রই কঠিন, তাই বিয়ের বয়স (দশ বছর? —তামিল[২০]) এগিয়ে এলে বহু বাপ-মায়েরই "হরিভক্তি উড়ে যায়।"[২১] কেবলই মনে হয় মেয়ে যেন বড়ো তাড়াতাড়ি 'সোমত্ত' হয়ে উঠছে। তাই বাঙালির[২২] চোখে যা "কলাগাছের বাড়" তামিলভাষীদের[২৩] চোখে তা "ঝিঙেগাছের বাড়।" ওদিকে সিন্ধি[২৪] মেয়েরা যখন বেড়ে ওঠে "তরতরিয়ে ওঠা কোনও চারাগাছের মতো," কাশ্মীরি[২৫] মেয়েরা বাড়ে "খোবানি পাকার" এবং গুজরাতি[২৬] মেয়েরা "গোবর জমে ওঠার" মতোই ঝটপট।

ব্যাপারটা নিয়ে এত আতঙ্ক এইজন্য যে—

মেয়ে বড়ো হলে বাপের বুকে যে
উনুন হয়ে সে চাপে—
দগ্ধে মারে সে তাপে। (মারাঠি[২৭])

সারারাত জেগে থাকে সে-বাপ
যার ঘরে আছে মেয়ে বা সাপ। (গুজরাতি[২৮])

ঘরে যদি থাকে ঝি—
তেতো হয়ে যায় যে-রকম হয়
পড়ে থাকে যদি ঘি। (ওড়িয়া[২৯])

কিন্তু লোকে যে বলে "মেয়েদের যোগ্য স্থান হল আপ-ঘর বা বাপ-ঘর (মারাঠি[৩০])?" তা হলে মেয়ে যদি বাপের বাড়িতেই রয়ে যায় আপত্তি কীসের?

না না, ওসব কথার কথা, আসল কথাটা হল— "মেয়েদের মানায় কেবল শ্বশুরবাড়িতে আর শ্মশানে (গুজরাতি[৩১])।"

এবং এই মহান আদর্শটিকে সগৌরবে মান্য করার নিদর্শনও আছে। মেয়ের বিয়ে দিতে পারেনি এমন কোনও বাবা বা মাকে এও বলতে শোনা গেছে—"চলে যা মা রাবি নদীতে, সেখানে তোকে নিয়ে ওপারে কেউ যাবেও না, তোকে নিতে ওপার থেকে কেউ আসবেও না (পাঞ্জাবি[৩২])।"

অন্যত্র এও শোনা যায় যে, "মেয়ে মরলে প্রথমে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরে সুখই মেলে (ওড়িয়া[৩৩])।"

তা, কন্যাসন্তান যদি এত বড়ো বালাই হয়, তা হলে লোকেদের এত মেয়ে হয়ই বা কেন?

জীবনে যে যত করেছে পাপ
হয়েছে সে তত মেয়ের বাপ। (মারাঠি[৩৪])

এখানে অবশ্য ধর্মের কলের দৌলতে মেলা কর্মফলের কথাই বলা হয়েছে, তবে অন্যত্র কার্যকারণের হিসেবও পাওয়া যায়।

ছেলের আশায় করল চাষি
সাতটা মেয়ে পয়দা,
বেচতে হল ভিটে মাটি
এই হল তার ফয়দা। (হিন্দি[৩৫])

অর্থাৎ সরকারের পরিবার পরিকল্পনার নীতি যে-জিনিসটা সম্পর্কে লোকেদের সাবধান করে দিতে চাইছে এটা ঠিক তা-ই। গোড়ায় কটি মেয়ে হলেও তাতেই সন্তুষ্ট থেকো, ছেলেব আশায সংখ্যাটি বাড়িও না।

কোথাও কোথাও তো এমন কথাও বলা হয়েছে—

সুলক্ষণা সে-বউ সবার চেয়ে
ছেলের আগে যে বিয়োবে মেয়ে। (পাঞ্জাবি[৩৬])

তবে হ্যাঁ, মেযে হওযা ভালো এই শর্তে যে সংখ্যাটা যেন দুইয়ের বেশি না হয়।

প্রথম মেয়ে স্বাদে খই
পবেরটি তো মালাই,
আরও একটা মেয়ে হলে
তিনজনই বালাই। (বিহারি[৩৭])

আবার কোথাও কোথাও কাম্য সংখ্যাটা তিন অবধি উঠেছে।

তিনের পরেও মেয়ে আরেক!
বেচতে হবে চালার পেরেক। (তামিল[৩৮])

কিন্তু সংখ্যাটা পাঁচ হলে?

পঞ্চকন্যা যারই
হবেই সে ভিখারি। (মলয়ালাম[৩৯])

পাঁচটা মেয়ের বাবা হলে
রাজাও বনে যেত চলে। (তামিল[৪০])

সংখ্যাটা যা-ই হোক, অনেকের কাছেই মেয়ে বৃষ্টির মতোই কাম্য, কিন্তু তারা জানে— "অতি বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট (পাঞ্জাবি[৪১])।"

সেইরকমই—

ফসল নষ্ট বন্যায়,
জীবন অধিক কন্যায়। (হিন্দি[৪২])

মেয়েদের নিজেদের অবস্থা তো আরও করুণ হয়। বিশেষ করে ওরা যখন দেখে একে একে সমবয়সি মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

সকাল থেকে বাজছে শানাই
আজ যে বিয়ের তিথি,
করে শিরশির পাড়ার যত
আইবুড়োদের সিঁথি। (মারাঠি[৪৩])

মনটা কাটা ঘায়ের মতো টাটিয়ে থাকে, নিরীহ ঠাট্টাতেও তাতে নুনের ছিটে পড়ে।

বউকে কুমারী বলেছি যেই
সে তো হেসে কুটি কুটি,
কুমারী শালিকে বলেছি যেই
সে কী তার ভিরকুটি! (উর্দু[৪৪])

বয়স পেরিয়ে গেলে হতাশার চাপে কারও কারও মাথার গণ্ডগোল দেখা দেয়।

সিঁদুর দেখলে কারও মাথায়—
সিঁথি রাঙাতে মাথা ফাটায়। (হিন্দি[৪৫])

কাউকে কাউকে আবার নিজেদেরই জন্মদাতা-দাত্রীর হ্যাটা সহ্য করতে হয়।

কী ফল ফলেছে, ঘরে রেখে দিলে
মেরে যায় দরকচা,
হাটে তা যায় না বেচা। (কোঙ্কনি[৪৬])

তাও তো ফলটির গতি করার জন্য চেষ্টাচরিত্র করার কেউ ছিল, কিন্তু যাদের নেই?

মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মায়ের চাড়ই সবচেয়ে বেশি থাকে। সেটা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার দরুন তো বটেই, তা ছাড়া বয়স্ক মহিলারাও মায়েদের বেশ ভয় খাইয়ে দেয় বার বার কন্যাদায়ের এক বিকট ছবি তুলে ধরে। এমনকী কোনও কোনও হবু-মাকে হয়তো নববধূ হিসেবেই শুনতে হয়—

যতদিন মেয়ে আসছে না পেটে
যা খাওয়ার খেয়ে নাও,
যতদিন বউ আসছে না ঘরে
প'রে নাও যা-যা চাও।
(ওড়িয়া[৪৭], মারাঠি[৪৮],তুলনীয় বাংলা[৪৯])

কিন্তু মা যতই মেয়ের বিয়ের জন্য হেদিয়ে যাক, বাপও যাবে সে ভরসা কোথায়? এমন পুরুষও তো হয় যারা ভগবানের কাছে কাকুতি মিনতি করে—তাদের যেন একটাও মেয়ে না হয় এবং তাদের যেন এক ক্রোশও হাঁটতে না হয় (রাজস্থানী[৫০])। এরকম লোকের মেয়ে হলে তার মা একা করবেটা কী?

বাবা যদি করিৎকর্মা হয়ও, মেয়ের মা স্বর্গবাসী হলে সে-বাপের ওপরও ভরসা রাখা যায় না খুব একটা। কেননা "মা মরলে বাপ তালুই" কথাটা মেয়ের বাপের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

সরে যায় যদি মায়ের হাত
বাপ থাকতেও মেয়ে অনাথ। (তামিল[৫১])

এর ওপর যদি মেয়ের একটা সৎমা জোটে তা হলেই হল।

সতিনের মেয়ে—সে যেন ওলের শাক,
না যদি বিকোয় পড়ে থেকে পচে যাক। (বিহারি[৫২])

তবে দক্ষিণ ভারত ও মহারাষ্ট্রের একটা প্রথা সমস্যাটাকে খানিকটা বোধ হয় সামলেছে। অন্তত খোঁজাখুঁজি বাছাবাছির ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছে বাপ-মাকে।

মামাতো বোনের সাথে বিয়ে—
জিজ্ঞাসাবাদ কাকে নিয়ে? (তামিল[৫৩])

পাত্র তোরই তো মামা!
বাকি আছে তার আর কী জানাব?
তত্ত্বতালাশ থামা। (তামিল[৫৪])

এ প্রথা গড়ে ওঠার কারণ আছে। এই সব অঞ্চলে পারিবারিক সম্পত্তির ওপর মেয়েদের অধিকাব প্রাচীনকাল থেকেই খুব জোরদার ছিল। তাই এরকম একটা ভাবনা কাজ করত যে আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হলে গোটা সম্পত্তিটা নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই রয়ে যাবে। তা ছাড়া, ভাগনেদেরও তো একটা তাগিদ থাকে মামাদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার এবং মামারাও চায় ভাগ্নিদের একটা হিল্লে হয়ে যাক।

না না, উত্তর ভারতীয় দৃষ্টিতে এটা দেখলে চলবে না, সেখানে তো পাতানো বোনকে বিয়ে করাটাকেও বাঁকা চোখে দেখা হয়।

বসায় পাশে 'বোনটি' বলে,
বউ ক'রে সে ডেরায় তোলে। (গুজরাতি[৫৫])

'বোন-বোন' ওরা ক'রে তো যায়,
শেষে ভাগনে করে আদায়। (গুজরাতি[৫৬])

মামা-ভাগ্নির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। চাইলেই যে মামাকে ছাদনাতলায় টেনে আনা যায় তা কিন্তু নয়। মামাদেরও অনেক বায়নাক্কা থাকে। সেই জন্যেই কোনও কোনও মেয়ের-বাপকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়—"পয়সাওলা লোকের অনেক শালা, কিন্তু কোনও শালাই গরিবদের জামাই হতে চায় না (উর্দু[৫৭])।"

মামা পাত্র হলে সেখানে আবার একটা অলিখিত নিয়ম থাকে—

দিদির মেয়েকে না ক'রে গাপ
বোনের মেয়েকে তা করা পাপ। (কন্নড়[৫৭])

এতে মামা চিড়বিড়িয়ে উঠে বলতেই পারে—

বোনের মেয়েকে মনে যে ধরেছে,
করবই আমি তাকে বিয়ে;
দিদি কেন তাতে বাধা দিতে চায়?
রাগ করে কেন এটা নিয়ে? (কন্নড়[৫৮])

তা ছাড়া, বোনের সম্পত্তি ও দেওয়া-থোয়ার ক্ষমতা যদি দিদির চেয়ে বেশি হয়, সেখানেও মামা বলতে পারে—

দিদির বলেই টাকাটা চাল?
বোনের হলেই তা ভুসিমাল? (তামিল[৫৯])

এসবের জন্য ভাই-বোনেদের মধ্যে আকছা-আকছি চলতেই পারে। এবং ব্যাপারটা বাড়া-বাড়ির পর্যায়ে চলে গেলে কোনও কোনও ভাই চাইতেও পারে বোনটির পরিবারের সঙ্গে কেরল বেড়িয়ে আসতে এবং দিদির সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি করে মরতে (তামিল[৬০])।

আবার, নিজেদের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে বলে যে পণে খুব ছাড় পাওয়া যায় তা নয়। অবশ্য সেভাবে দেখলে হবু-বেয়ান-মেয়েকে হবু-বেয়াই-বাবা বলতেই পারে—

নিয়েছিল নটা নারকোল গাছ
তোমার বিয়েতে শ্বশুর,
ছেলের বিয়েতে আঠেরোটা চেয়ে
হল কি এমন কসুর? (তামিল[৬১])

ওদিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হওয়ার দরুন বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মানোর দুঃসংবাদও পাওয়া যায় প্রবাদের জগৎ থেকেই (তেলুগু[৬২])।

তবে এই প্রথাটি এক বিরাট দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে মেয়েদের বাবা-মাকে। কোথায় কার না কার হাতে পড়ে কী হাল হবে মেয়ের—এই অনিশ্চয়তা এতটাই কুরে খায় যে লোকে বলে—

নদীর ওপারে দেওয়ার চেয়ে
নদীতেই ফেলে দাওনা মেয়ে। (তেলুগু[৬৩])

শুধু বাংলা কেন, বহু অঞ্চলেরই মায়েদের চোখে তাদের মেয়েরা 'ফেলি'[৬৪]।

যমে নিলেও নিল
জামাই নিলেও নিল। (অসমিয়া[৬৫], ওড়িয়া[৬৬])

জামাই নিলেও যা
বাঘে নিলেও তা। (ওড়িয়া[৬৭])

মেয়েকে সুদ্ধু সারাজীবনের কামাই—
লুটে নিয়ে গেল কোথায় কে জানে জামাই! (হিন্দি[৬৮])

শেষেরটায় একটু খটকা লাগে যে, অতটাই যদি পণ দিতে হয় তা হলে সাধ করে মেয়েকে নির্বাসনে পাঠানো কেন?

কে জানে, গেঁয়ো যুগি যেমন ভিখ পায় না তেমনিই নিজের গাঁয়ে তেমন দরের পাত্র জুটছিল না হয়তো ওর।

ছেলেদের মনোভাবই নাকি এইরকম—

গাঁয়ের মেয়েতে বিঘ্নি—
নাকে নাকি তার শিকনি। (ওড়িয়া[৬৯], তুলনীয় বাংলা[৬৯'])

কিংবা পাত্রটি হয়তো একটু বেশিই শাঁসালো ছিল বলে কন্যাকর্তা তখন লোভ সামলাতে পারেনি, এখন কাঁদুনি গাইছে। নয়তো গাঁয়ে তো ছেলের অভাব নেই। কথায় বলে "কুমারী

মেয়ের সামনে একশোটা বর একশোটা ঘর (মারাঠি[৭০])।" অবশ্য ছেলে মানেই তো আর পাত্র হয় না, এমন তো কত আছে যাদের—

আন্নার বাড়ি চান সেরে নিয়ে
কুট্টার বাড়ি খাওয়া,
শোয়ার জন্য দেখে নিতে হয়
খালি আছে কার দাওয়া। (কোঙ্কনি[৭১])

এরা প্রায় সাধু-সন্ন্যাসী।

বিয়ের জন্য সাধু ধার নেয় কী কী?
সব কিছু, মায় টিকি। (তেলুগু[৭২])

এদের হাতে মেয়ে দেওয়া হলে?

নুন দেয় যদি সুব্বা,
আটা দেয় যদি আন্না—
তবে শুরু হয় রান্না। (কোঙ্কনি[৭৩])

তাই তত্ত্বতালাশ ও সরেজমিন তদন্ত সেরে নিয়েই তবে মেয়ের বিয়েতে এগোনো নিয়ম। কেননা—

যাচাই না করে জামাই করার
মানেই সর্বনাশ,
যেমনটা হয় পাঠিয়ে হুকুম
করলে ভাগের চাষ। (পাঞ্জাবি[৭৪] ও হিন্দির[৭৫] অংশ)

সেইজন্য বলা হয়—

ঘর দেখো, বর দেখো ভালো করে ঢুঁড়ে,
কুঁজ আছে কি না দেখো দেয়ালটা ফুঁড়ে। (ওড়িয়া[৭৬])

এও বলা হয়—

ভিক্ষে দাও পাত্র দেখে,
মেয়ে পাত্রের গোত্র দেখে। (তেলুগু[৭৭])

তবে যে-পরামর্শটা আলাদা করে কাউকে দিতে হয় না তা হল—

শক্তপোক্ত গাছ দেখে চাই
যত্ন করে পোঁতা—
গোলমরিচের লতা। (মলয়ালমের[৭৮] অংশ)

খোলসা করে বলতে হলে—

মেয়েকে বাঁধো এমন বজ্রপাশে,
মেয়ে যেন না ফেরত চলে আসে। (হিন্দি[৭৯])

ওদিকে মেয়ে-বাছাইয়ের ব্যাপারেও অনেক ভালো ভালো উপদেশ পাওয়া যায় প্রবাদের

জগৎ থেকে। কিন্তু সব ওলট পালট করে দেয় 'ফরসা রঙের' দাপট যা রূপের প্রায় সমার্থক।

ফরসা রঙেব কাটতি এত
চাপা পড়ে যায় ঘাটতি শত। (মারাঠি[৮০])

অথচ 'গোরা গা'য়ের[৮১] মোহ কাটানোর জন্য কী না করা হয়েছে। কখনও নরম সুরে নিরপেক্ষ থাকতে বলা হয়েছে।

দেখো কেন ফরসা-কালো?
বংশে রাখা ভরসা ভালো। (বিহারি[৮২] ও ওড়িয়ার[৮৩] অংশ)

কখনও রীতিমতো নজির দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, বাইরের রূপটার তেমন মূল্য নেই।

বউটা যত ফরসা
তত নোংরার একশা। (মারাঠি[৮৪])

কখনও শুধুই সাবধান কবে দেওয়া হয়েছে।

অঢেল ফসল পাবে তুমি
মাটি যদি হয় রসালো,
বউটা তেমন যেন না হয়
কালো হলে জেনো ভালো। (কন্নড়[৮৫], তুলনীয় বাংলা[৮৬])

রূপে যে-বউটা মেনকা-রম্ভা
কাজের বেলাতে অষ্টরম্ভা। (মলয়ালম[৮৭])

কখনও শুধু পরিণতির কথাটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরী বউ যার
বউ তার বরদার। (হিন্দি[৮৮])

কিন্তু তার পরেই যতসব অশৈলী কাণ্ডের কথা।

কালোরা শুধুই বরের,
ফরসা সর্বজনের। (কোঙ্কনি[৮৯], মারাঠি[৯০])

বউ হলে রূপসি
বর থাকে উপোসি। (হিন্দি[৯১])

সুন্দরী বউ এনে থাক যদি
টিলায় করেছ চাষ,
ফসল তুলবে বারো ভূতে আর
তোমার ভাগ্যে ঘাস। (তামিল[৯২])

নাঃ থাক ওসব হিংসুটে নিন্দুকদের কথা। সতী-সাবিত্রীর দেশে ওসব শোনাও পাপ।

তা ছাড়া দর্শনদারির চেয়ে গুণের বিচার মোটেই কিছু কম করা হয় না। বরং জোর দিয়েই বলা হয়—

গুণ ছাড়া রূপ
জল ছাড়া কূপ। (গুজরাতি[৯৩])

এবং গুণ মানে অবশ্যই ভালো গৃহিণী হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা "খাড়া তালগাছ, শালকাঠ, চালায় হেঁতাল বাঁশ, বেতের গাঁট আর দক্ষ গৃহিণীই ঘরকে চিরস্থায়ী করে তোলে (ওড়িয়া[৯৪])।" জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের সময় এই দিকটা ভালো করে যাচাই করে নেওয়া চাই। এখানে কোনও ভুল করা চলে না, কেননা "শ্রমিক ভুল করলে তাকে ভুগতে হয় এক দিন, চাষি করলে এক বছর, কিন্তু স্বামী করলে সারাটা জীবন (ওড়িয়া[৯৫])।"

কিন্তু কনে দেখানোর মঞ্চে বসানো মেয়েদের দেখে তাদের ভেতরের কতটাই বা জানা যায়! যেমন আমরা তো সবাই জানি নত মুখ সুশীলতারই লক্ষণ—তাদের কেউ ব্যভিচারিণী বলে না (মারাঠি[৯৬]), কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত-পরিচয় ভূয়োদর্শী বলেছেন—

মাথা নিচু করা মেয়ে,
গলা উঁচু করা বলদ—
মানেই কোথাও গলদ। (গুজরাতির[৯৭] অংশ)

আবার দেখুন, যে-মেয়ের চোখে সহজেই জল আসে তার মনটা যে নরম হবে তা ধরেই নেওয়া হয়। সদাহাস্যময় পুরুষও তো আমাদের প্রিয়! কিন্তু প্রবাদের জগৎ থেকে একাধিক কণ্ঠে শোনা যায়—

দাঁত দেখানো পুরুষ,
ছিঁচকাঁদুনে নারী—
কুচুক্কুরের ধাড়ি। (গুজরাতি[৯৮,৯৯], কন্নড়[১০০], মলয়ালম[১০১])

বরং প্রবাদের জগৎ মেয়ে-বাছাইয়ের সময় গরু-মোষ বাছার পদ্ধতির ওপরই বেশি ভরসা করেছে।

গরু আনতে দেখবে সেটার জাত,
মেয়ে আনতে তার বংশের ধাত। (কন্নড়[১০২])

যেহেতু গ্রামভারতের বহু পরিবারেরই অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল দু-একটা গরু বা মোষের ওপর, বেঠিক বাছাই মানে তাদের 'কাল হওয়া'[১০৩]। যেহেতু বউ বাছতে ভুল হলে শেষে একদিন বলতে হতে পারে "অভাগার মরে গরু, ভাগ্যিমানের মরে জরু" মেয়েদেরও পেডিগ্রি দেখতে বলা হয়েছে আরও অনেক অঞ্চলেই।

গরু আনতে দেখবে সেটার দাঁত,
মেয়ে আনতে তার বংশের ধাত। (হিন্দি[১০৪])

গরু আনতে দেখবে সেটার বাঁট,
মেয়ে আনতে তার বংশের ধাত। (মারাঠি[১০৫])

অবশ্য মনুর প্রতিধ্বনি হিসেবে এর উলটোটাও শোনা যায়।

খুঁজো নাকো নদীর মূল,
দেখো নাকো কনের কুল। (তেলুগুব[১০৬] অংশ)

তবে মেয়ে বাছাইয়ের আরও যে একটা পন্থা আছে সেইটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

ঘোষ আনবে দুধটা চেখে,
মেয়ে আনবে মাকে দেখে। (তেলুগু[১০৭], তুলনীয় বাংলা[১০৮,১০৯])

মেয়ের স্বভাব-চরিত্র যে মায়ের মতোই হবে এই বিশ্বাসের জোর এতটাই যে, হেন ভাষা নেই যাতে এ কথা বলা হয়নি। কয়েকটা উপমা বেশ মজার, যেমন—"যেমন কুকুর তেমনি ল্যাজ (কন্নড়[১১০])," "যেমন বলদ তেমনি মাটি-চষা (অসমিয়া[১১১])," "যেমন কলসি তেমনি খোলামকুচি (গুজরাতি[১১২,১১৩])," "যেমন গম তেমনি রুটি (মারাঠি[১১৪])।"

অনেকের আবার এই পন্থাটার ওপর এতটাই আস্থা যে মেয়েকে চাক্ষুষ দেখার প্রয়োজনও বোধ করে না।

দেখে তো নিলাম মাকে আমরা ঘাটে,
মেয়েকে দেখতে আর কে অত হাঁটে! (তামিল[১১৫])

অবশ্য মাকে দেখে ওরা কী বুঝল সে-রহস্য থেকেই যায়। এমন তো কিছু দেখেনি যাতে বলতে হয়—"মা লাফালে সাত হাত মেয়ে লাফাবে আট হাত (তামিল[১১৬])?"

তবে যতই আঁটঘাঁট বাঁধা হোকনা কেন কপালে থাকলে ঠকতেই হয়, কেননা "হাজাব মিথ্যা কথার পরই একটা বিবাহ সম্পন্ন হয় (কন্নড়[১১৭])।" এমনকী পাত্রী হিসেবে ছোটো বোনকে দেখিয়ে বড়ো বোনের বিয়ে দেওয়াও হয় (মলয়ালম[১১৮])।" আবার এমনও হয় যে বর পণ হিসেবে একটা জঙ্গলের হাতিকে দেখিয়ে দিযে মেয়ে পার কবে দেওয়া হল (মলয়ালম[১১৯])।"

সে আর কী করা যাবে, মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবেই। এখন না হয় গ্রামাঞ্চলেও বহু নারীপুরুষই বিয়ে না করেও দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু এক সময় মেয়েদের কাছে অন্তত বিয়েটা একরকম বাধ্যতামূলকই ছিল। তাই একটা সোজা হিসেব ছিল—

যত ভাই তত ঘর,
যত মেয়ে তত বর। (ওড়িয়া[১২০])

যেহেতু বরাবরই বাবাদের ওপর একটা চাপ ছিল যে মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, বহু অসহায় পাত্রীরই কপালে জুটেছে বেমানান বর। তবে রূপ বা গুণের সঙ্গে কপালও থাকলে কোনও কোনও গরিব ঘরের মেয়ের বিনা পণে সচ্ছল ঘরে বিয়ে হয়েও যায়। এমনকী রূপকথার বাইরেও হঠাৎ রানি হয়ে যায় কোনও কোনও 'ঘুঁটেকুড়ুনি' (গুজরাতি[১২১])।

কিংবা ওইরকমই অন্য কোনও মেয়ে।

রানি হয়ে গেল আঘাটে রাজার
মনে ধরে গেল যাকে,
বাকিরা মরুর কত পথ ভেঙে
কলস বইতে থাকে! (রাজস্থানী[১২২])

এরা রাজস্থানের সেইসব অঞ্চলের মেয়ে যেখানে 'জলকে চলা' মানে মাথার ওপর ঘড়ার পর ঘড়া সাজিয়ে রোজ দল বেঁধে দশ-বিশ মাইল হাঁটা। রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলে বরপণ অনেকটা নির্ভর করে জলের উৎস থেকে পাত্রের গ্রামের দূরত্ব কত তার ওপর। তাই গরিব ঘরের মেয়েদের কপালেই এই অমানুষিক পরিশ্রম লেখা থাকে। শোনা যায় সহ্য করতে না পেরে কোনও কোনও মেয়ে আত্মহত্যাও করে। অথবা বেছে নেয় কোনও সম্পন্ন বৃদ্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষের জীবন।

অবশ্য মালদার বুড়ো ভামদের দাপট সারা ভারতেই। এবং বর হিসেবে যে তাদের যোগ্যতা নেই সে কথা বলার জো নেই।

পেরিয়ে কুড়ি বউ যে বুড়ি
এক কোণে সে থাকনা।
দেখনা ছুঁড়ি, ষাট বছরেও
রয়েছি কেমন মাকনা। (অংশত হিন্দি[১২৩])

বাংলাতেও[১২৪] তো আমরা দেখেছি লাঠি ধরে ওঠা-বসা বুড়োরাও নিকার নামে মাকনার মতো ছোটে। এদের ভাবটা হল—

যেতে চাস যা যৌবন—
রেখে দিয়ে যা রংঢং। (রাজস্থানী[১২৫])

তবে বুড়ো বরের যৌবন নিয়ে 'ছুঁড়ি'দের বিশেষ মাথাব্যথা থাকার কথা নয়, তারা তো জানেই—

বৃদ্ধ নিছক সিঁদুর
নিষ্ঠাবতী হিঁদুর। (মারাঠি[১২৬])

এবং এও জানে যে অচিরেই তাকে বলতে হবে—

বুড়ো বর যেন ভাঙা দেয়াল,
এত লেপি পুঁছি তবু বেহাল। (মারাঠি[১২৭])

কিন্তু প্রবাদের জগতে অন্যরকম কানাঘুষোও চলে। নিন্দুকে বলে—

বরাসনে বৃদ্ধ বর পরার্থেই বসে,
হিতাকাঙ্ক্ষার বশে।
(গুজরাতির[১২৮] অংশ, অংশত বিহারি[১২৯] ও ওড়িয়া[১৩০])

ঝুনো নারকোল, তার সাথে কচি ডাব—
পাড়াপড়শির তাতে হয় বড়ো লাভ। (তামিল[১৩১])

তবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় নাকি আগের পক্ষের ছেলেরা। তাই—

বৃদ্ধ পিতা করতে গেলে বিয়ে
পুত্র হাঁটে সামনে মশাল নিয়ে। (কন্নড়[১৩২], তেলুগুর[১৩৩] অংশ)

সে যা-ই হোক, কিন্তু সে বিয়েতেও কোনও গাফিলতি চলবে না।

আইন ভেঙে হয় না যেমন
ঘটিচোরের বিচার,
বুড়োর বিয়েও বাদ দেয় না
একটাও স্ত্রী-আচার। (রাজস্থানীর[১৩৪] অংশ

তবে বুড়োর বিয়ে মানেই কিন্তু তরুণী-বধ নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে এর পেছনে নিরুপায়তাও থাকে।

খোকা-খুকুই পারত যদি
করতে ঘরের কাজ,
আনতে বুড়ি বাবা কেন
পরবে বরের সাজ? (রাজস্থানী[১৩৫])

তা ছাড়া, যেখানে "বিয়ের আদর্শ বয়স হল তিরিশ আর দশ (ওড়িয়া[১৩৬])" একটা সময়ে তো মেয়ে বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হচ্ছেই।

আর, শুধু বুড়োদেরই বা ধরা কেন, বুড়িরাও কি বাদ যায়?

যৌবন গেলে খসন—
শীতের পর পশম। (হিন্দি[১৩৭])

এমনকী এও হয়—

ঠানদিদি বিয়ে করে
নাতি মিছে কাঁদে পড়ে। (পাঞ্জাবি[১৩৮], উর্দু[১৩৯], রাজস্থানী[১৪০])

শুধু তা-ই নয়, আরও কত রকমের বিয়ে হয়! বাংলায়[১৪১] আমরা শুনেছি আইবুড়ো মায়ের মেয়ের বিয়ের কথা, অন্যত্র শুনতে পাই—

কনে এক-ভাতারি
বরের মা কুমারী। (গুজরাতি[১৪২])

কনে সদ্য-বিধবা,
মা-টি তার দ্বিধবা। (গুজরাতি[১৪৩])

বর তো আগেই একটি নারীর ভর্তা,
চিরকুমার বাবা হল বরকর্তা। (গুজরাতি[১৪৪])

কিন্তু.... অ্যাই অ্যাই ব্যাটা মোষ!
যেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যাস
এই তোর বড়ো দোষ। (মারাঠি[১৪৫])

হ্যাঁ, আমার কলমটা হয়েছে ঠিক তা-ই, কেবলই আমায় বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। না, এবার একটা একদম ব্যাকরণ সম্মত বিয়ের কথায় আসতে হবে।

ধরা যাক, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষে পাত্র জোগাড় হল। অনেক দর কষাকষির পর দেওয়া-থোয়ার ব্যাপারেও ওদের রাজি করানো গেল। তাতে পাত্রী ফুট কাটতে পারে

—"ভিখিরি রাজি ভিক্ষেতে (গুজরাতি[১৪৬])।" তবে নিজে অরাজি হবে না, কেননা প্রায়শই মেয়েদের নিজেদেরও এতে সায় থাকে।

মেয়েরা যাবে তো কাঁদতে কাঁদতে
আঁচলে গয়না বাঁধতে বাঁধতে। (হিন্দি[১৪৭], তুলনীয় বাংলা[১৪৮])

মেয়েরা বাবার নয়নের মণি,
গিয়ে শ্বশুরকে করে দেয় ধনী। (সিন্ধি[১৪৯])

তা, অপরকে ধনী করে দেওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে তারা নিজেরাও নিশ্চয়ই ধনী। ব্যবসায়ীর জাত বলে সিন্ধিরা তা হনও। যেমন গুজরাতিরাও। ওঁদের মেয়েদের সম্পর্কে মারাঠিরা বলেন—

গুজরাতি পুতলি
গয়নার পুঁটলি। (মারাঠি[১৫০])

সুতরাং মেয়ের সংখ্যা যদি তেমন একখানা হয় পোঁটলা হালকা হতে কদিন লাগবে? আমরা তো আগেই শুনেছি—

পাঁচটা মেয়ের বাবা হলে
রাজাও বনে যেত চলে। (তামিল[৪০])

সে না হয় হল, কিন্তু পাত্রকে মেয়ের মনে ধরেছে তো?

যদি না ধরে থাকে ক'জন সেটা মুখ ফুটে বলতে পারে? তবে চোখের ভাষায় ওরা হয়তো বলবে—

আমরা তো গরু-গাই—
যেখানে তোমরা টেনে নিয়ে যাও
চুপচাপ চলে যাই। (গুজরাতি[১৫১])

তা, প্রবাদের জগতে যে বার বার মেয়েদের গরু-মোষের পাশে বসানো হয়েই থাকে তার নিদর্শন তো কয়েক পৃষ্ঠা আগেই আমরা পেয়েছি। তবে তাতে মেয়েদের আঁতে লাগার মতো কিছু বোধ হয় ছিল না। তবে তেমন-তেমন ব্যাটাছেলেরা মেয়েদের চতুষ্পদেরই ইতর-বিশেষ বলে মনে করে বটে।

কুকুরের নখ আঠেরোটা বলে
দোবে সামলায় জুতো,
ঘর সামলায় মেয়েখা, কারণ
নখ বেশি আছে দুটো। (মারাঠি[১৫২])

এদের মতো কোনও লোকের হাতে মেয়ে না পড়লেই মঙ্গল, তবে "মেয়ের চাল যেখানে বাঁধা আছে বিয়েটা তার সেখানেই হবে (ওড়িয়া[১৫৩])।"

কিন্তু খরচপত্র?

অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায়—

অথৈ কুয়োর তলটা পেতে
শেষ হয়ে যায় হাতের দড়ি,
মেয়েকেও তার বর জোটাতে
শেষ হয়ে যায় বাপের কড়ি। (তেলুগু[১৫৪])

কিন্তু থাক, ওসব বুক-হিম-করা আলোচনায় না গিয়ে বরং দেখা যাক সবচেয়ে কম খরচে বিয়ে সারার রেকর্ড কোথায় রয়েছে। শোনা যায় প্রবাদের জগতের কোনও এক গ্রামে নাকি বিনা পয়সায় সিঁদুর পাওয়া যাচ্ছিল বলে গাঁ-সুদ্ধু লোক বিয়ে করে নিয়েছিল (হিন্দি[১৫৫])। যেখানে সে-সুবিধে নেই সেখানে—

সিঁথির রেখায় সুরকি দিয়ে
হয় বেচারি মেয়ের বিয়ে। (হিন্দি[১৫৬])

আবার যেখানে সিঁদুর ফিঁদুরের ঝামেলাই নেই, সেখানে—

জুতো জামা আমি দানেই পেয়েছি
তবুও পড়েছি কারে,
মোল্লাজি তুমি বিয়েটা আমার
করিয়ে দাওনা ধারে! (উর্দু[১৫৭])

তবে পয়সা যে একেবারেই খরচ হবে না, সবসময় তা হয় না।

আধ পয়সায় বিয়ে
বাজির খরচ নিয়ে। (মলয়ালম[১৫৮], তামিল[১৫৯])

আর, বিয়ের আড়ম্বর নিয়ে কীরকম রেকর্ড আছে?

কত ধুমধাম করে এ বিয়ের
বরযাত্রীরা গেল,
বর, তার ভাই, নাপিত, পুরুত—
চার-চারজন ছিল। (রাজস্থানী[১৬০])

অনেকের কাছে অবশ্য এটা আধুনিক রেজেস্ট্রি বিয়ের মতোই ছিমছাম ঠেকবে। সাক্ষী হিসেবে বরের ভাই আর নাপিতই তো যথেষ্ট, বরযাত্রীর দরকারটাই বা কী? বরং ওদের ভূমিকাটাই অপমানকর, কেননা—

বর কনে দোঁহে মিলে গেলে
বরযাত্রীরা এলেবেলে। (হিন্দি[১৬১])

এসব বিয়েতে বোধ হয় বেশি জটিলতা থাকে না, নয়তো সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠান খুব সোজা-সরলভাবে সম্পন্ন হয় না। হবেই বা কী করে? গোটা ব্যাপারটা শুরুই তো হয় তিনরকম বাঁকা জিনিস দিয়ে—বরযাত্রার পালকির বাঁশ, শানাই আর কন্যাপক্ষের লোকেরা (বিহারি[১৬২])।

অবশ্য বরযাত্রীরা কন্যাপক্ষের সবকিছু বাঁকা দেখবেই। আর কিছু না হোক ভোজের পাঁপড়কে বাঁকা তো বলবেই।

হোকনা পাঁপড় চাঁদের মতোই গোল
বরের মা তো করবেই শোরগোল। (মারাঠি[১৬৩])

তবে এগুলো বাহ্য ব্যাপার, ওসব থেকে বোঝা যায় না কোন পক্ষ আদতে কতখানি বাঁকা। যেমন—

ফকির হয় না আলখাল্লায়,
আমির হয় না বাকতাল্লায়,
যায় না বোঝা বেয়াই কেমন
যদি না পড় তার পাল্লায়। (হিন্দি[১৬৪])

ওদিকে বরের কতটা কী বাঁকা তা নিয়ে কিছু বলার জো নেই। বললেই শুনতে হবে "সোনার আংটির আবার ব্যাঁকাট্যারা!" যদিও খবর পাওয়া যায় যে বরের অনেক বাঁকা জিনিসই বউয়ের হাতে পড়ে সোজা হয়।

সিধে হল মাথার পাগ
ঘরে এল যখন মাগ। (উর্দু[১৬৫], বিহারি[১৬৬])

তবে যে বাঁকাটা সবচেয়ে বেশি ভোগায় তা হল শেষ মুহূর্তে বরের বেঁকে বসা। অবশ্য তারও দাওয়াই আছে।

বর কি করছে বেগড়বাই?
'হাতে-পায়ে' ধরে চ্যাংদোলা করে
ছাদনাতলায় নিয়ে তো যাই! (ওড়িয়া[১৬৭])

অবশ্য এসব খুব বেশি ঘটে না। আরে বাবা, ছেলেদের নিজেদেরও তো একটা তাগিদ থাকে! কথায় বলে—

ছেলে বলেই তাই
মেয়ে চাই-ই চাই। (মলয়ালম[১৬৮])

বিশেষ করে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর যাদের পাত্রী জোটে তাদের ভাবটা বরং হয় এইরকম—

আজকেই হোক পাকা দেখা,
হোক না কালই বিয়ে,
এর পরে আর ভরসা কোথায়
জুটবে কোনও মেয়ে! (হিন্দি[১৬৯])

সত্যিই তো, পাত্রী জুটছে না এমন ছেলেও তো বিস্তর আছে। এদের মধ্যে অনেকেই রীতিমতো বিয়ে-পাগল হয়ে ওঠে। আর, যারা বদ্ধ-বিয়ে-পাগল তাদের জন্য তো কোনও ওষুধও নেই, কেননা—

পাগলামিটা সারতে পারে
দাও যদি ওর বিয়ে;
মুশকিল—ওই পাগলটাকে
কে দেবে তার মেয়ে। (তেলুগু[১৭০])

সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, কেননা "নারীর সঙ্গ ছাড়া পুরুষ লোমছাড়া কুকুরেরই মতো (কাশ্মীরি[১৭১])।"

দুই

যা-ই হোক, বিয়ের পর্ব তো চোকে কিন্তু তার পর?

বর ও কনের গাঁটছড়া তো
বেঁধে দিল পুরুত,
ঘাড়ে সংসার পড়ার আগেই
হল ব্যাটা ফুড়ুৎ। (গুজরাতি[১৭২])

তা সংসারটা কেমন?

কোনও কোনও বউকে বলতে শোনা যায়—

তিনটে ইটের চুলো
ত্রিলোক দেখিয়ে দিল। (মারাঠি[১৭৩])

তেমনিই কোনও কোনও বরও বলে—

বরণমালা দেখতে লাগে বেড়ে,
যে পরে সে ফেলতে চায় তা ঝেড়ে। (অংশত মলয়ালম[১৭৪])

কিন্তু না, এখনও সেসব কথা বলার সময় হয়নি। এখন তো সবে সম্পূর্ণ অচেনা দুটি মানুষ মুখোমুখি।

নুন ছিল সাগরে, আমলকি পাহাড়ে,
একদিন ও-দুটির দেখা হল আহারে। (মারাঠি[১৭৫])

তা, বউকে সবার লাগল কেমন?

পাড়াপড়শির কাছে 'কেমন' মানে 'দেখতে কেমন'। শোনা যায় এক শাশুড়ি তার বউকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে মুখ দেখে আঁতকে উঠে বলেছিল— "ওমা এ যে আমার মতোই দেখতে (বিহারি[১৭৬])।" সেরকম হলে অবশ্য মুশকিলের কথা। তবে বরেরাই বা কী এমন ময়ূর-ছাড়া কার্তিক যে বউদের ডানাকাটা পরি হতে হবে। তা ছাড়া সমান নম্বর পাওয়া বর-বউ আর কটা হয়? সেরকম দেখলেই বরং লোকে অবাক হয়ে বলে—

যেমন পত্নী তেমনি পতি—
ধন্য তুমি প্রজাপতি। (ওড়িয়া[১৭৭])

সুতরাং মোটামুটি চলনসই হলেই বউরা পাড়াপড়শির কাছে পাস করে যায়।

আর না করলেই বা কী?

সেই তো হবে রাঁধুনি,
রূপ নেই বলে কাঁদুনি। (অংশত মলয়ালম[১৭৮])

এমনকী এ কথাও লোকে বলে—

বউ যদি হয় কাজের
দরকার নেই সাজের। (উর্দু[১৭৯])

আর বউয়ের চালচলন?

সেখানেও নেহাত জাত-নিন্দুক না হলে পাড়াপড়শিরা পাস করিয়েই দেয়। নিন্দের কিছু পাবে কী করে? "নতুন রাজা বা বউরা যে তাদের আসল রূপটা দেখিয়ে দেওয়ার আগে গোড়ার দিকে লজ্জা সঙ্কোচ বজায় রাখে (গুজরাতি[১৮০])!"

এমনকী প্রতিবাদহীনও হয়।

'ফরসা' শুনে তুষ্ট,
'কালো'তে নয় রুষ্ট। (রাজস্থানী[১৮১])

অনেক বউ তো এসে গোড়ায় খুব কাজও দেখায়। কেউ কেউ নাকি কুঁড়ে ঘরের চালায় উঠেও ঝাঁট দেয় (মলয়ালম[১৮২])।

তাই এমনিতে তেমন নিন্দেমন্দ কেউ করে না বটে, তবে তার মধ্যেও হয়তো দু-একটা বেফাঁস কথা শোনা যায়।

চামড়া কি লোহা, লাকড়ি কি বউ
আখেরে কী দাঁড়ায়—
সেটা না দেখে কি ভালো না মন্দ
সিধে বলে দেওয়া যায়? (রাজস্থানীর[১৮৩] অংশ)

আসল রূপটা চেনা যায় শুধু
ফাল্গুন মাসে গরুর,
অভাবের দিনে জরুর। (পাঞ্জাবির[১৮৪] অংশ)

বউ কিংবা মোষের গুণ
কেবল তখনই গাই—
যখন প্রমাণ পাই। (গুজরাতি[১৮৫])

যার সাথে ঘর করনি
সেই বুঝি বড়ো ঘরনি? (ওড়িয়ার[১৮৬] অংশ)

প্রসব বেদনা সয়
তবে তো গৃহিণী হয়! (মারাঠি[১৮৭])

এ তো গেল অন্যদের কথা, বরেদের নিজেদের কেমন লাগল বউদের, সেইটাই হল আসল। কেননা—

বউ যদি না বরের মনে ধরে
মনে হয় তার জানলা নেইকো ঘরে। (কন্নড়[১৮৮])

এতে বউদের নিজেদেরও দিনগুলো খুব সুখে কাটে না, কেননা—

বউ যদি না মনে ধরে
দোষ হয় সে যা-ই করে। (মলয়ালম[১৮৯])

তবে সুখের কথা, প্রবাদের জগতে নতুন বউদের সুখ্যেত করতে বরেদের কম দেখা যায় না।

দেখতে দেখতে চাঁদবদনির হাসি
সবজি ছাড়াই ভাত ওঠে এক কাঁসি। (হিন্দি[১৯০])

এক পয়সারও ডাল—
দুপুরে রাত্রে খাইয়ে গিন্নি
আবার খাওয়াবে কাল। (উর্দু[১৯১])

বলছি খেয়ে কসম—
বউটা আসায় পাঁঠাও দিচ্ছে পশম। (উর্দু[১৯২])

আহা বউ তুই মিষ্টি কত,
তুই যে গুড়ের পাটালি!
ভাই-বোনেদেব ঝুটঝামেলা
তুই তো এসে হটালি। (মারাঠি[১৯৩])

হয় যদি আমাশা
বউটাই ভরসা। (মারাঠির[১৯৪] অংশ)

বলার ˙ তো আর কোনও গুণ যদি নাও থাকে ওই শেষেরটার জন্যই বউকে ফুলমার্কস দেওয়া যায়। কেননা, "যেমন বেশ্যাদের কাছে কিছু চেয়ে কতটা কী পেলাম তা থেকে তাদের প্রেমের বহর জানা যায়, তেমনিই পতিদেবতার মল পরিষ্কার করতে কতটা রাজি তা থেকে বউদের প্রেমের ওজন মাপা যায় (মারাঠি[১৯৫])।"

আর প্রেমিক হিসেবে সার্টিফিকেট পেতে তো বরেদের এসব কিছুই করতে হয় না, শুধু বউকে যে ভালোবাসে তা আকারে ইঙ্গিতে জানালেই হল এবং ভেতরে ভালোবাসা থাকলে বর বউকে ভালোবাসবেই, তা সে যেমনই মেয়ে হোকনা কেন।

যদিও বউটা খ্যাপা
বর তো ভাবে না হ্যাপা! (সিন্ধি[১৯৬])

হোকনা বউটা কানি
বরের চোখে সে রানি। (পাঞ্জাবি[১৯৭], তুলনীয় বাংলা[১৯৮])

ব্যাঙমুখো বউ তার—
পদ্মিনী কোন ছার! (হিন্দি[১৯৯])

বর যেখানে বাঁদর
বাঁদরিও পায় আদর। (সিন্ধি[২০০])

আর, বরের কাছে আদর থাকলে শুধু যে বাড়িসুদ্ধু লোক তার কদর করে (মারাঠি২০১) তা নয়,

ভাতার যদি ভালোবাসে
শিলনোড়ারাও বাসে,
নইলে মাগের খাটনি দেখে
খিলখিলিয়ে হাসে। (হিন্দি[২০২], অংশত কন্নড়[২০৩, ২০৩*])

এবং যে-বর ভালোবাসে না সে তো বরই নয়!

গুছিয়ে রাখলে ঘর
মনে মিললে বর। (কন্নড়[২০৪])

তবে শুধু ভালোবাসলেই হয় না, বউকে সেটা মালুম পাওয়াতেও হয়। আর তার সেরা উপায় হল মাঝে মধ্যে একটু আহা-উহু করা।

আর কেন বউ চরকাখানা
করছিস ঘরঘর,
এক থলি চাল এনেছি তো
এবার উঠে পড়। (গুজরাতি[২০৫])

খবর পাওয়া যায়—কোনও কোনও বউ নাকি বরের কাছে আদর কাড়ার জন্য "বরকে আসতে দেখেই চরকার সামনে বসে পড়ে (অসমিয়া[২০৬])।" এখানেও হয়তো ঠিক তা-ই ঘটেছিল, তবে তা যখন বিফলে যায়নি সেও হয়তো বরকে বেশি খাটাখাটনি করতে দেখে কোনও একদিন বলবে—

সোনাদানায় কাম নেই
থাকো চোখের সামনেই। (তামিল[২০৭])

তখন হয়তো দুজনেই গলা মিলিয়ে বলবে—

এক পয়সার আখ যে চুষি
তাতেই দোঁহে আমরা খুশি। (মারাঠি[২০৮])

এখন জগতে "শুধু তুমি আর আমি, আর কারও দরকার নেই (মারাঠি[২০৯])।"

চিংড়ি বলে লাউকে
আর চাই না কাউকে। (মণিপুরি[২১০])

দুটি প্রাণ মাতে আহা কী রঙ্গে!
সিন্ধুসারস যেন তরঙ্গে। (মলায়ালম[২১১])

বিশেষ বিশেষ পরিবেশে জুটির এই একাকীত্ব আরও মনোরম হয়ে ওঠে।

বরষাতে
বর সাথে। (হিন্দি[২১২])

দাম্পত্য কলহও তখন সুস্বাদু।

রাগ করে বউ-বর—
দুধে পড়ে কিছু সর। (হিন্দি[২১৩])

কলহের কারণটা হয়তো এইরকম কিছু—

আমার জন্য হ্যানত্যান
নিজে খায় শুধু ফ্যান। (হিন্দি[২১৪], অংশত ওড়িয়া[২১৪*])

আস্ত একটা বর পেয়ে বউ তখন ভেবে পাচ্ছে না—

গোলায় রাখবে তাকে?
তুলে কি রাখবে তাকে? (হিন্দির[২১৫] অংশ)

আর বরের তো "বউ একটু চোখের আড়াল হলেই বাড়িটাকে হানাবাড়ি বলে মনে হয় (হিন্দি[২১৬])।"

বউটা থাকলে গায় বাড়ি আহ্লাদে,
বউ না থাকলে ঘরগুলো যেন পাদে। (হিন্দি[২১৭])

কেউ কেউ উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে বলেও ফেলে ফস্ করে—

ওগো বউ তুমি নয়নের মণি
আমার বুকের ধন,
তোমার কাছেই সর্বস্ব
করছি সমপর্ণ। (মারাঠি[২১৮])

এসব কেউ শুনে ফেললে মুখ টিপে হেসে হয়তো বলবে—

নদী প্রিয় হলে গঙ্গা,
নারী প্রিয় হলে রম্ভা। (তেলুগু[২১৯])

এবং নিন্দুকেরা বলবে—দাঁড়াও, এখন তো সবে কলি সন্ধে।

বউ যে এখনও টাটকা আচার,
নতুনের নেশা করেছে নাচার। (তেলুগু[২২০])

বউ নওলা
গাই দুধেলা। (বিহারি[২২১])

অর্থাৎ ওরা বলতে চায় যে, এখন নতুন আছে বলেই বরেদের এত অদিখ্যেতা, আরও কিছুদিন যাক তখন বোঝা যাবে কতখানি পত্নীপ্রেম। এও বলে যে, "বউ নতুন থাকে মাত্র ন-দিন (সিন্ধি[২২২])।" এবং মতান্তরে—

বরের সোহাগ দু-দিন,
তারপরে যায় সুদিন। (গুজরাতি[২২৩])

তবে কি স্থায়ী দাম্পত্য-প্রেম বলে কিছুই নেই?

আছে আছে সব আছে, কিন্তু প্রবাদের জগৎ সেসব শুনবে কেন? খুঁত ধরা যে ওদের স্বভাব। কয়েকটা সুখী গৃহকোণের ছবি ওরা যাও বা দেয় তা নিন্দের তোড়ে উড়ে যায়।

দাম্পত্য সুখের প্রধান খাদ্য যে টাকা তা প্রবাদের জগতে পুরুষেরাই ঘরে আনে। তাই বাংলায়[২২৪] বলা হয় "মরদের ভাতার কড়ি (উর্দু[২২৫])।" তা, কীরকম রোজগার করে আমাদের প্রবাদের জগতের মরদেরা?

থুতুই আয় থুতুই ব্যয়,
না সে পায়, না সে দেয়। (গুজরাতি[২২৬])

ফুরসত নেই দম ফেলবার,
এক পয়সার নেই কারবার। (গুজরাতি[২২৭], মারাঠি[২২৮], অংশত কাশ্মীরি[২২৯])

দেখি না তো কাজ করতে,
সময় পায় না বসতে। (মারাঠি[২৩০])

তাও তো ওদের অন্তত গতরটা নাড়াতে দেখা যায়, কিন্তু এরা কী?

ওগো নির্ধন 'ধনী'!
কাজ না করে বসে থাকলে
আমরা প্রমাদ গনি। (গুজরাতি[২৩১])

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে ধনীর আবার রোজগার করার দরকারটা কী। আসলে পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চলেই স্বামীকে 'ধনী' বলে ডাকাই রীতি, হয়তো লজ্জায় ফেলে চাপে রাখাই উদ্দেশ্য। এর ফলে যদি স্বামীরা উদ্যোগী পুরুষ হয়ে ওঠে, স্বীকৃতি তাদের দিতেই হয়, কেননা—

টঙ্কা এত শক্তিধর
বউকে দিয়ে করায় গড়। (হিন্দি[২৩২], মারাঠি[২৩২"])

আবার অর্থের অনর্থকরী দিকটাও আছে।

কাঁচা বয়স কাঁচা টাকা—
কঠিন মাথা সামলে রাখা। (রাজস্থানী[২৩৩])

আরেকটি শ্রেণি আছে যাদের রেস্ত-রোজগার হয়তো খুব খারাপ নয়, কিন্তু.......

আমার 'উনি' বড়োই রসিক
হাজারটা পান খান,
আগে পিছে পাওনাদার
নিয়ে সে-নবাব যান। (বিহারি[২৩৪], হিন্দি[২৩৫])

বরেরা যদি মোটামুটি কাজ-চালানো গোছের হয়, কাজে-কম্মে তারা তেমন দড় না হলেও বউরা অভাবটা পুষিয়ে নিতে পারে।

বর যদি হয় ন্যালাখ্যাপা
বউ তেজী হয় সইতে হ্যাপা। (গুজরাতি[২৩৬])

কিন্তু একেবেরে অপদার্থ স্বামীর চেয়ে বড়ো বালাই আর হয় না। বউরা জেরবার হয়ে গিয়ে বলে—

কোনও কম্মেই নেই যে লোকটা
যুদ্ধে গেলে তো পারে—
লাগবে বাতাস হাড়ে। (উর্দু[২৩৭], অংশত তেলুগু[২৩৭*])

খুব বউ-বউ করত শুনেছি
বরটা বিয়ের আগে,
বউ আনলে যে খাওয়াতে হয়
জেনে সে এখন রাগে। (বিহারি[২৩৮])

ভাঙা ঘরে রেখে
ভাসাল আমাকে ভাতার,
ভালো হত যদি
গিন্নি হতাম ছাতার। (হিন্দি[২৩৯])

চালচুলোর সমস্যা যেখানে তেমন নেই বরের অন্য খুঁতগুলো চোখে ফোটে।

এত নোংরার হদ্দ
গায়ে বিটকেল গন্ধ। (বিহারির[২৪০] অংশ)

বরটা আমার খাসা—
যে-কটা চুল রয়েছে মাথায়
সব উকুনের বাসা। (রাজস্থানীব[২৪১] অংশ)

হালুয়া কেন, লপসি খেতেও
যেতে অমত নাই,
ছ'কুড়ি মাইল হাঁটতে রাজি
ননদিনির ভাই। (রাজস্থানী[২৪২])

নেই তো পেটে বিদ্যা,
তবুও করব ছেদ্দা! (তেলুগু[২৪৩])

ইস্কুলে পড়া বিবি কি সয়?
হেঁসেলে ঢোকা পুরুষও নয়। (কন্নড়[২৪৪])

আবার এক ধরনের বর আছে যারা কারণে-অকারণে কেবলই বউয়ের খুঁত ধরে।

খিটখিটে বর
যেন ভাঙা ঘর। (কন্নড়[২৪৫])

এমন ঝামেলা পাকায়—
দইয়ে কাঁকর দেখায়। (কন্নড়[২৪৬])

মিনসে এমন ধাউড়—
লুনেশাকে নুন হয়নি
তা-ই করল চাউর। (তেলুগু[২৪৭], অংশত মারাঠি[২৪৮])

শাকটা এমনিতেই এত নোনতা, নুন দিলেই বরং সমস্যা হয়। সুতরাং বোঝাই যায় বেচারি কেমন লোকের হাতে পড়েছে। আবার আরও এক ধরনের বরের খবর পাওয়া যায় যারা এক একটা উপদ্রব বিশেষ।

ঠ্যাটা মিনসেটা বাড়ি এলে
কত যে বালাই—
ভর দুপুরে চাইবে আমি
পিদ্দিম জ্বালাই। (রাজস্থানী[২৪৯])

এরা সব শাহেনশা, ধমকে ধামকে বউদের কাছ থেকে শুধু খেদমত আদায় করে নেওয়াই এদের কাজ।

খেঁকি কামারটা হাতুড়ি যখনই ফসকায়
বউকে খামখা খুব খানিকটা কড়কায়। (গুজরাতি[২৫০])

এসবের ফল?

বরকে খিঁচোতে দেখে—
আর পাঁচজন বউটাকে শুধু
চোখ রাঙাতেই শেখে। (তামিল[২৫১])

ভিখিরিটা এসে শুনে গেল আজ
বরটা বলছে ছেনাল,
কাল যদি ওকে ভিক্ষে না দিই
ও-ও তো পাড়বে সে-গাল। (তেলুগু[২৫২], অংশত তেলুগু[২৫৩])

এরকম হবেই, কেননা "ঘরের লোক শুধু 'ঝগড়ুটে' বললেও বাইরের লোক তাকে 'বেশ্যা' বলে (মারাঠি[২৫৪])" এবং "ঘরের লোক শুধু আঙুল তুললেও বাইরের লোক পা দেখায় (তেলুগু[২৫৫])।"

আর নিন্দে খোদ পতির মুখ থেকে বেরোলে তো তার ট্রান্সমিশন ক্ষমতা সাংঘাতিক!

নিন্দে স্বয়ং মা করলে
করবে সারা গ্রাম,
বর করলে গ্রামের সীমাও
পেরোবে বদনাম। (তামিল[২৫৬])

ফলে এদের বউদের এ ব্যাপারে আর কোনও সংশয়ই থাকে না যে—

বরেদের দয়ামায়া তত
তালগাছ দেয় ছায়া যত। (তেলুগু[২৫৭])

সাপও হয় না নাচার
আপন হয় না ভাতার। (মারাঠি[২৫৮])

তবে এরাও যে একেবারেই বউদের ভালোটালো বাসে না তা নয়, কিন্তু মুশকিল হল—

খাটে তো সোহাগ অমন!
নামলে যেন শমন। (তেলুগু[২৫৯])

অনেকে আবার শয়নমঞ্চেও শমন হয়ে উঠতে পারে। এমনকী ফুলশয্যার রাত্রেও।

প্রথম হামিতে হামড়ে
দিল কিনা গাল কামড়ে! (হিন্দি[২৬০])

অবশ্য যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন চুম্বন ব্যাপারটা নাকি আসলে কামড়েরই রকমফের এবং আদতে এক যৌনবিকৃতি (যা থেকে জাপানিরা নাকি মুক্ত), সুতরাং এরা কোনও ভিন্ন গোত্রের লোক নয়। তবে আরেক শ্রেণির বর আছে যারা সব কিছুরই উর্ধ্বে।

গুণধর বর লোক এনে যদি
নিজে তুলে দেয় খাটে—
নামতে হয় কি হাটে? (তেলুগু[২৬১])

উফ্ আর সহ্য হয় না, "ওহে বউরা, অত পতিনিন্দা না করে রামনাম জপ করোনা (হিন্দি[২৬২])!"

তা ছাড়া বউরা বলছে বলেই কি এগুলোকে বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে?

না নিলেও হয়, তবে এটা ঠিক যে—

ওস্তিল মাছের মতোই বউরা
এটা জানে তলে তলে—
বর কত বাঁও জলে। (তামিল[২৬৩])

কিন্তু বরেদেরও কি বলার কিছু নেই?

কতকগুলো কথা অবশ্য সব বউ সম্পর্কেই বলে থাকে বরেরা। যেমন—

যত সুখ দেয় নারী
সব কেড়ে নেয় শাড়ি। (অংশত মারাঠি[২৬৪])

একবার বউ আনো—
চলতেই থাকে সকাল সন্ধে
এটা আনো সেটা আনো। (মারাঠি[২৬৫])

বউটা এমন খরচে—
মুদিটাই লাভ করছে। (মারাঠি[২৬৬])

বউয়ের এত জাঁক
বরের ট্যাঁকটি ফাঁক। (হিন্দি[২৬৭])

কথায় কথায় করে সে মান
বার বার অত ধরে কে কান! (হিন্দি[২৬৮], অংশত হিন্দি[২৬৯])

বিয়ের আগে চন্দ্রমুখী,
বিয়ের পরে সূর্যমুখী,
আর কিছুদিন গেলে দেখি
বউটি আমার জ্বালামুখী। (গুজরাতি[২৭০])

তবে এগুলো নেহাতই হাই তোলার শব্দের মতো কথাবার্তা। যেহেতু "বউ আর জলবৃষ্টি মানেই বক্রদৃষ্টি (গুজরাতি[২৭১])" এটুকু না বললে 'বউয়া' বা 'স্ত্রৈণ' নাম কিনতে হয়। তবে বউদের সম্পর্কে আরও কয়েকটা খবর যা পাওয়া যায় তা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে।

যার বউ মিহি পিষতে পারে না,
রুটি বেলে গোদা ছাঁদে—
লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। (রাজস্থানী[২৭২])

ভোরেই পান্তা সেঁটে—
বোঝে নাকো বউ বেলা হয়ে গেলে
কী চলে বরের পেটে। (তেলুগু[২৭৩])

দেখা যাচ্ছে এ-বউ গৃহিণী হিসেবে একেবারেই ফেল-মারা। এ তো রীতিমতো বরকে শুকিয়ে মারার ফন্দি!

কিন্তু বলতে যাও, বউয়েরা রে-রে করে উঠে বলবে—

দেখেছ বরের ট্যাকের হাল?
গৃহিণীপনা দেখানো যায়
ঘরের ভাঁড়ারে থাকলে ডাল। (মারাঠি[২৭৪], অংশত মারাঠি[২৭৫])

কিন্তু ডালে টান পড়লেও কীভাবে চূড়ান্ত গিন্নিপনা দেখানো যায় তা তো দেখিয়েছেন এক পুরুষই। পুরুষোত্তম।

তিনের বদলে এসে পড়ে যদি তেরো,
শ্রীরামের বাণী—ডালে জল ঢালো আরো। (রাজস্থানী[২৭৬], অংশত গুজরাতি[২৭৭])

তা ছাড়া কোনও কোনও বউয়ের নিজেদের বেলায় তো জোগানের অভাব ঘটে না! বরং উলটো চাপ দেয় তারা।

সারাদিনই মুখ চলে,
বরকে পেটুক বলে। (কোঙ্কনি[২৭৮])

স্বজন পোষণেরও কমতি নেই।

নিজের দিকের আত্মীয় এলে
বানাতে বসবে মিষ্টি,
আর কেউ এলে বউ যা করবে
সে এক অনাছিষ্টি। (পাঞ্জাবি[২৭৯], কাশ্মীরি[২৮০])

তারপর, মেনে নেওয়া গেল অনেক বরই কুঁড়ে[২৮০], কিন্তু বউরাই বা কীসে কম যায়?

হয়েছে তো বেলা সূর্যই শুধু
বেরোয়নি মেঘ ফুঁড়ে,
পড়ে আছে বউ মটকাটি মেরে
মহারানি এত কুঁড়ে। (রাজস্থানী[২৮১])

কোনও কোনও বউয়ের ক্ষেত্রে এ ঢিলেমি তো রোজকার ব্যাপার।

দেরি ক'রে রুটি নিয়ে যায় ক্ষেতে
সূর্যের সাথে চাষি ওঠে তেতে। (তামিল[২৮২], অংশত রাজস্থানী[২৮৩])

বরেদের আরেকটা বড়ো বালাই হল বারমুখো বউরা।

যেখানেই যান বাঁজ
ফিরতে তেনার সাঁঝ। (মারাঠি[২৮৪])

বাড়িখানা যেন কুকুরের ডেরা
পাড়াবেড়ানি যে বউ—
কানে বাজে শুধু 'ঘউ'। (হিন্দি[২৮৫])

তারপর তো আছেই বাপের বাড়ির নাড়ি না কাটাতে পারা মেয়েরা। একবার গেলে ফিরতে যেন গায়ে জ্বর আসে।

বাপের বাড়িতে ছিল বিয়ে.
ফিরল সে মুখে-ভাত দিয়ে। (মারাঠি[২৮৬])

এর ওপর বউ যদি 'বড়োলোকের বিটি' হয় তা হলেই হয়েছে। কথায় কথায় বউ—

রেজাই পুড়িয়ে চলে যায়
বাপের বাড়ির ভরসায়—
বড়ো যে গরম পয়সায়! (রাজস্থানী[২৮৭])

তবে অতটা সাহস যে ওদের হয় তার কারণ, ওরা জানে—

বউ যদি না আসতে চায়
বার বার সে তলব পায়। (গুজরাতি[২৮৮])

যেসব বর খাল কেটে কুমির আনে তাদের আপশোশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

বড়ো ঘর দেখে ভেবে তো ছিলাম
বোয়াল তুলেছি ডাঙায়,
এখন দেখছি গিন্নিটি হয়ে
কেবলই সে চোখ রাঙায়। (গুজরাতি[২৮৯])

আপন মনেই গজগজ করতে হয়—

সকাল থেকেই মাগির মেজাজ তিরিক্ষি;
সামাল দেব? মুখ ছোটানোর হিড়িক কী! (হিন্দি[২৯০])

যার জন্য শাঁখা সিঁদুর
তাকেই কিনা বলে ইঁদুর! (অসমিয়া[২২১])

নিজেই পড়ল হড়কে
দোষ দিল সে বরকে। (বিহারি[২২২])

আবার এমন এমন বউয়েরও খবর পাওয়া যায় যাদের কোন গোত্রে ফেলা যাবে সেইটাই বিরাট প্রশ্ন।

চুমুটাও খেতে জানে না বউ
কোপ মেরে যায় ঝোপে—
লালা সে লাগায় গোঁফে। (হিন্দি[২২৩])

আদর দেখাতে মোছে
শিকনি বরের মোচে। (বিহারি[২২৪])

নিজেই মাথায় তুলে গোসাপ
করতে থাকে 'বাপরে বাপ'। (মারাঠি[২২৫], তুলনীয় বাংলা[২২৫ক])

রসের নাগর দিলে গাল
বরের ওপর ঝাড়ে ঝাল। (হিন্দি[২২৬])

এ ছাড়াও আরও আছে, আরও—

বউ যদি চোখ মারে
ঘর যায় ছারেখারে। (তেলুগু[২২৭])

অ্যাঁ! এ তো দেখা যাচ্ছে এসব বউয়ের কোনও শিক্ষাদীক্ষাই নেই। এদের যখন বিয়ে হয় লোকে বলে—

যার মেয়ে সে তো নিশ্বাস ফেলে বাঁচে,
যার ঘরে যায় তার জীবনটা কাঁচে। (সিন্ধি[২২৮])

এবং ক'দিন যেতেই বরটা গজগজ শুরু করে—

বাপের বাড়িতে জ্বালিয়ে খেয়েছে মাকে,
শ্বশুরবাড়িতে পেয়েছে এই আমাকে। (কন্নড়[২২৯])

কিন্তু এসব মেয়ে এরকম হয়ই বা কেন?

একটা বড়ো কারণ হল—অতি-আদর।

খিচুড়ি নষ্ট বেশি বেশি নাড়ানাড়িতে,
মেয়েরা নষ্ট আদরের বাড়াবাড়িতে। (গুজরাতি[৩০০])

যেমন, এই বউটার কথাই ধরা যাক—

বাপের কাছে সে যেটাই চাইত
পেয়ে যেত সবকটা—
তাই বউ রণচটা। (মারাঠি[৩০১])

তবে হ্যাঁ, 'লক্ষ্মী মেয়ে' হিসেবে নাম ছিল এমন মেয়েও বিয়ের পর বিগড়ে যেতে পারে।

কারণ হিসেবে যেটার কথা সবচেয়ে বেশি শোনা যায় তা হল—

খেত বরবাদ হয়ে যায় যদি
তাতে ঢোকে পাকদন্ডি,
বউ পয়মাল হয় হাটে ঘুরে
পেরিয়ে আপন গণ্ডি। (অসমিয়ার[৩০২] অংশ, অংশত পাঞ্জাবি[৩০৩], তুলনীয় বাংলা[৩০৪])

গান হারায় বাটে,
জল হারায় ফাটে,
বউ হারায় হাটে। (ওড়িয়া[৩০৫])

এবং আরও যা শোনা যায়—

হলে বউ বারমুখো,
আর বর ঘরকুনো—
বরবাদি হয় দুনো। (তেলুগু[৩০৬])

তা, কথাটা মিথ্যে নয়, কেননা "বাইরে ঘোরাঘুরি করলে পুরুষ কুড়োয় অভিজ্ঞতা আর মেয়েরা বদনাম (সিন্ধি[৩০৭])।"

তবে বউরা বিগড়ে যেতে পারে একেবারে উলটো কারণেও।

ফসল নষ্ট তাড়াহুড়ো বাড়াবাড়িতে,
গৃহিণী নষ্ট অধিক নজরদারিতে। (তামিল[৩০৮])

যেমন, হয়তো দেখা গেল—

বউ যখন মাঠ সারে
বর ভাবে—অভিসারে। (হিন্দি[৩০৯])

এইসব সন্দেহবাতিক বউদের মন খিঁচড়ে দেয়। এবং ফল?

ডালটা বিগড়ে গেলে—একদিনই যা কষ্ট,
আচার বিগড়ে গেলে—বছরখানা নষ্ট,
বউরা বিগড়ে গেলে—পুরোটা জীবন ভ্রষ্ট। (গুজরাতি[৩১০])

তিন

এমন দম্পতির দেখা আমরা প্রায়ই পাই যেখানে—

বউ মতিহীন, বর গতিহীন। (তেলুগু[৩১১])

কিন্তু তার মানে কি বউ নষ্টমতি হলে বরের আর গতি থাকে না?

বালাই ষাট, তা হতে যাবে কেন? হাতে কি পক্ষাঘাত হয়েছে? এটা তো সারা দুনিয়া জানে যে "বউ জব্দ কিলে"[৩১২] এবং "মূর্খ নারী আর নাকাড়াকে না পেটালে কাজ হয় না (হিন্দি[৩১৩])।" বরেরা সেটা জানবে না তা কি হয়? বরং অনেকেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করবে—

চিঁড়ে তো বানায় ভাত পিষে,
সিধে হবে বউ আর কীসে? (কোঙ্কনি[৩১৪])

সিধে কি বউরা হয়?

অনেকেই হয়, অনেকেই হয় না।

আবার অনেকে তো বুঝতেই পারে না যে বর ওদের ওপর চটেছে।

বরটা চাইছে বউ দিক নাকে খত,
বউটা চাইছে বর দিক নাকে নথ। (হিন্দি[৩১৫], অংশত উর্দু[৩১৬] ও পাঞ্জাবি[৩১৭])

কেউ কেউ আবার হিসেবের গরমিলটা কোথায় সেটাই ধরতে প্যারে না।

আনলাম বর এক মন ধান দিয়ে,
ভালো তো বাসে না মারে মন প্রাণ দিয়ে। (অসমিয়া[৩১৮])

কোনও কোনও বউ আবার বরের মারকে জল-বাতাসের মতোই স্বাভাবিক জিনিস বলে মনে করে।

কার কাছে গো করব নালিশ
ভিজিয়ে দিলে বিষ্টি?
বরটা দিলে পিট্টি? (মারাঠি[৩১৯])

হয়তো এরা অন্য বউদেরও দলে টানতে চায়।

লাগলে তেতো কেউ কখনও
করলা দেয় ফেলে?
বরকে ছেড়ে যেও না তুমি
হাত যদি তার চলে। (কন্নড়[৩২০])

এরা শুধু আশায় বসে থাকে—

আসবে কবে দিন সে
কিলোবে না আর মিনসে? (হিন্দি[৩২১])

কোনও কোনও বউ আবার বরের ধৈর্যের পরীক্ষাও নেয়।

যতই মারুক ব্যথাই হবে হাতে,
আমার স্বভাব বদলাবে না তাতে। (বিহারি[৩২২ ৩২৩])

আবার কোনও কোনও বউয়ের প্রেম সাংঘাতিক।

যতই তুমি দাওনা আমায়
আচ্ছা করে ধোলাই,
তবুও আমি ভাতের তলায়
লুকিয়ে দেব মালাই। (বিহারি[৩২৪])

আবার কেউ কেউ দিনের বেলায় যা-ই হোকনা কেন রাত্রে সব ভুলে যায় (তেলুগু[৩২৫])।

যতই মারুক সমস্ত দোষ কাটে—
পতি-পত্নী ওঠেন যখন খাটে। (কন্নড়[৩২৬])

লোহা যখন তাতে—
একজোট হয় কামার তখন
তার বউয়ের সাথে। (মলয়ালম[৩২৭])

তা, বউদের ক্ষেত্রে দিন-রাতের মধ্যে বিস্তর তফাত তো ঘটে যায়ই।

দিনের বেলায় ছায়াকেও তার ভয়,
রাত্রে সাঁতরে নদীও সে পার হয়। (পাঞ্জাবির[৩২৮] অংশ, তুলনীয় বাংলা[৩২৮*])

তবে সব বউই যে খুব স্বেচ্ছায় বরের সান্নিধ্যে যায় তা নয়, বরং পড়ে উভয়-সঙ্কটে।

না গেলে সবাই বলবে 'বাঁজ',
গেলে তো সইতে হবেই ঝাঁঝ। (বিহারি[৩২৯])

সে নয় হল, কিন্তু বরেদের এত হাত চলেই বা কেন?
শোনা যায়—

সাপ মার খায় ল্যাজের জন্য
বউরা বাক্যব্যাজের জন্য। (মলয়ালম[৩৩০])

ধোপানি যতটা করে চোপা,
ঠিক ততটাই মারে ধোপা। (গুজরাতি[৩৩১])

বাক্যবাগীশ হোক গে যত চারণ,
ভালো বউদের মুখ খোলাটাই বারণ। (পাঞ্জাবি[৩৩২])

দেখলে শুধু ঠ্যাঙানি
দেখনি তো ভ্যাঙানি। (মারাঠি[৩৩২*])

তবে এমন এমন বরও আছে যারা স্বভাবেই মারকুটে, বউ-ঠ্যাঙানোর জন্য তাদের কারণের দরকার হয় না।

আমার হাতের জুতোটা আজ
করছে বরো নিশপিশ,
সেঁকের জন্য মালসাটা বউ
গরম করে নিস। (তামিল[৩৫২])

দাঁড়িয়ে থাকলে লাথি মারে,
বসে পড়লে ঘুঁষি,
রাত্রে শুলে চিমটি কাটে
বরটা যখন খুশি। (হিন্দি[৩৫৩])

তবে বরেরা যে সব সময় পার পেয়ে যাবে এটা হয় না। কখনও কখনও এমনও হয় যে—

বউ পেটানোর অর্থই গেলা বঁড়শি,
কেটেকুটে তাকে ভেজে খায় পাড়াপড়শি। (মণিপুরি[৩৫৪], অংশত তামিল[৩৫৫])

কখনও কখনও তো বউরা নিজেরাই রুখে দাঁড়ায়।

আমারই দিকে তো
এ গাঁয়ের সব মাথা,
মারো তো দেখি গো
ঘাড়ে আছে কটা মাথা! (তেলুগু[৩৫৬])

এমনকী কেউ কেউ সমানে সমানে লড়েও যায়।

কত্তা-গিন্নি ওরা যেন আহা
একটাই ছাঁচে গড়া,
দুজনেই দেখো ভাঙতে চাইছে
একে অপরের নড়া। (রাজস্থানী[৩৫৭])

এমনকী উলট পুরাণের গল্পও শোনা যায়।

থাকে যার ঘরে, যার খায় পরে,
আনে যে কলাটা-মুলোটা—
তাকেই পেটায় কুলটা। (অংশত কন্নড়[৩৫৮])

কিন্তু কেন?

সেটা জানা শক্ত, কেননা—

কেউ বলে না হারের কথা,
বোয়ের হাতের মারের কথা। (হিন্দি[৩৫৯])

তবে কীভাবে যেন ফাঁস হয়ে গেছে যে একটা বউ একবার রাজাকে দেখে, তুলনায় তার নিজের পতিটির হীন অবস্থার কথা স্মরণ করে রাগে-দুঃখে তাকে ঠেঙিয়েছিল (তেলুগু[৫৪০])।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, মেরে অবলারা পার পায় কী করে?

কোনও কোনও বউয়ের ফর্মুলাটা এইরকম—

বরকে মারে চড়চাপাটি ঘরে,
বাইরে এসে কান্নাকাটি করে। (তেলুগু[৫৪১])

আবার কেউ কেউ অন্য পথ ধরে।

বেতো শাশুড়িকে কিলিয়ে বউটা
উঠে পড়ে পরচালায়,
কেঁদো বরটাকে ঘা কতক দিয়ে
সোজা চলে যায় থানায়। (তেলুগু[৫৪২])

তা ছাড়া পরকীয়া প্রেমের ব্যাপার থাকলে অনেক পুরুষ সতীলক্ষ্মীর তেজ দেখে কিছুটা ভেবলেও যায়।

নতুন এসে তো আমার জন্যে
কেটেছিল কত দন্ডি—
আজ সে যে রণচণ্ডী। (হিন্দি[৫৪৩], অংশত মারাঠি[৫৪৪])

তবে বর হোক বউ হোক যে-ই মার খাকনা কেন মারেরও উপকারিতা থাকতে পারে।

জুতোর ঘায়ে শরীর থেকে
উড়ে গেল সব ধুলো,
ফুলের মতোই নির্মল আর
হালকা হয়ে সে গেল। (রাজস্থানী[৫৪৫])

বরের চড়টা বেড়ে ছিল,
বন্ধ নাকটা খুলে দিল। (তেলুগু[৫৪৬])

মাথায় রক্ত চড়লে মানুষ শুধু মারতেই চায় না, মরতেও চায়। এমনকী পুরুষেরাও।

দরকার হলে মরব,
মাগিকে বিধবা করব। (রাজস্থানী[৫৪৭], কোঙ্কনি[৫৪৮], গুজরাতি[৫৪৯])

এবং সেটা কখনও কখনও বউদের কাছে কাম্যও হয়।

গায়ে কী গন্ধ, করে না চান,
মরে যদি বাঁচি খুব বাঁচান। (বিহারি[৫৫০])

দিনরাত যার এত মেজাজ—
মরলেই ভালো, বরে কী কাজ! (হিন্দি[৫৫১])

পতির মৃত্যুকামনার স্বপক্ষে আরও অকাট্য যুক্তিও মেলে।

স্বপ্নে দেখেছি পতিটি আমার গত;
স্বপ্ন সত্যি করতেই হবে
দাম দেব চাই যত। (হিন্দি[৩৫২])

তার ওপর পতি-বিদ্বেষের মূলে যদি সতিন থাকে তা হলে তো কথাই নেই। কোনও এক বাঙালি বউকে আমরা বলতে শুনেছি "যমকে ভাতার দিতে পারি, সতিনকে তবু দিতে নারি।" অন্যত্র শোনা যায়—

মিনসেটা যাক সতিন মাগিটা থাক—
ড্যাবড্যাব করে দেখব সিঁথির ফাঁক। (ওড়িয়া[৩৫৩], অংশত কন্নড়[৩৫৪])

তবে বেশির ভাগ বউই চায় স্বামী নয়, সতিনকেই খাক উদবিড়ালি[৩৫৫]।

সতিন মাগি যাক মরে
শায়ার দড়ি থাক পড়ে। (হিন্দি[৩৫৬])

হ্যাঁ, 'শায়ার দড়ি' ওই দুই মাগের অধিপতি 'দুই-মেগোটিই', যাকে বাংলায়[৩৫৭] বলা হয়েছে 'খেঁতা কাপড়'। এ ঘৃণা স্বাভাবিক, কেননা—

কাল সে ছিল কঁ্যাতা,
আজকে বরের ন্যাতা। (হিন্দি[৩৫৮])

এমনিতেই সর্বক্ষণ এ জ্বালা তো আছেই, তার ওপর—

মাছিও খাটে বসালে ভাগ
মাথায় চড়ে ওঠে যে রাগ! (হিন্দি[৩৫৯])

কোনও কোনও স্বামী নাকি সুয়ো সম্পর্কে দুয়োর মুখের ওপরই বলে দেয়—

যত রূপ ওর চরণে
নেই তা তোমার বদনে। (হিন্দি[৩৬০])

কেউ কেউ আবার—

দুয়োকে বলে 'থুঃ',
খায় সুয়োটার গু। (মারাঠি[৩৬১])

দুয়োকে রাখে পরিয়ে ত্যানা
ঢাকে না তার গা-টি,
সুয়োর জন্য সোনার আশায়
খুঁড়তে বসে মাটি। (মারাঠি[৩৬২])

দুয়ো-মাগের ভাঙে হাড়
সুয়ো-মাগের বাড়ায় বাড়। (গুজরাতি[৩৬৩])

এই বাড় যদি অবাধ হয় একদিন হয়তো দুয়োকে মাথায় হাত দিয়ে বলতে হয়—

এই তো সেদিন বসেছিলাম
বিয়ের পিঁড়িতে,
পেতনি এসে নামিয়ে দিল
দাওয়ার সিঁড়িতে। (মারাঠি[৬৬৪])

কিংবা স্বয়ং পতিটিই বলে দিতে পারে—

অ্যাই মাগি যা বেরো—
তুই কপালের গেরো। (হিন্দি[৬৬৫], অংশত তেলুগু[৬৬৬])

অথবা বর যদি দুয়োকে একেবারে "আঁস্তাকুড়ের কুকুর"[৬৬৭] না বানাতে চায়, একটু ছাড় দিয়ে বলতে পারে—

দেখছি তোকে হচ্ছে পোষা মিছে,
আজ থেকে শো তেঁতুল গাছের নীচে। (গুজরাতি[৬৬৮])

তখন হয়তো দুয়োর বুকে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসবে—

মেয়ে তো নই আমি যে তির,
তাই তো শত্রুপুরে—
বাবা তুমি দিলে ছুড়ে। (কাশ্মীরি[৬৬৯])

এসব শুনে অনেক বউ হয়তো বলবে বাবাদের আর দোষ কী, পুরুষেরা হয়ই এইরকম। বরেদের চোখে নাকি "বউরা তাদের পায়ের জুতোর মতোই কদিন পরেই ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায় (পাঞ্জাবি[৬৭০])।" তাই তারা মনে করে—

বউ-বউড়ি ঘাসের জুতো
পালটানো যায় ইচ্ছেমতো। (কাশ্মীরি[৬৭১], অংশত হিন্দি[৬৭২])

তা সত্ত্বেও বলতে হয় প্রবাদের বরেদের খুব একটা দেখা যায় না আগের বউদের ফেলে দিতে। সহাবস্থানের খবরই পাওয়া যায় বেশি, যদিও সেটাকে কিছুতেই 'সম্প্রীতিপূর্ণ' বলা যায় না। উলটো রথে গেলে দুই সতিন যুক্তি করে কাঁঠাল হয়তো বা খেতেও পারে[৬৭৩], কিন্তু সোজা রথে গেলে সতিনেরা পরস্পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতেই চায়। এবং এ-দ্বৈরথে দুয়োর যা হাল হয় তা চোখে দেখা যায় না। পাঁচজনে হ্যাটা তো করেই, এমনকী কেউ কেউ চূড়ান্ত আস্পর্ধাও দেখায়। শেষকালে পাষণ্ড বরটা পর্যন্ত প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়—

ভিখিরি তুই, তোর যা কাজ—পয়সা মাগ;
তুই চাইছিস ভিক্ষে আমার পয়লা মাগ! (কন্নড়[৬৭৪])

তা, ভিখিরিটাকে তেমন দোষ কি দেওয়া যায়? কথায় বলে, "বেড়ালও দুর্বল হয়ে পড়লে ইঁদুর তাকে বিয়ে করতে চায় (হিন্দি[৬৭৫], অংশত গুজরাতি[৬৭৬])।"

দুয়োদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাসটা সর্বত্রই একরকম। কোনও মেয়ে সুয়ো হয়ে সংসারে ঢোকার চেষ্টা করলে প্রথমে তো ওরা খুব রুখে দাঁড়ায়। কেউ কেউ বরকেও হুমকি দিয়ে বলে—

না ছাড়লে আশনাই

এ ঘরে তোর বাস নাই। (হিন্দি[৬৭৭])

তারপর হতাশ হয়ে দুয়ো দেখে—

এমন জবর আশনাই

ছাড়বে যে বর আশ নাই। (উর্দু[৬৭৮])

শেষমেশ দুয়োকে হার মেনেই নিতে হয়। এমনকী হয়তো শেষে তাকে দেখা যায় প্রথা অনুসারে বরদক্ষিণা দিতেও।

সুয়োর বিয়ে সাঙ্গ হল যখন গোধূলি,

মধ্যরাতে দুয়ো দিল একটা আধুলি। (তেলুগু[৬৭৯])

তবে এমনও হতে পারে যে দেখা গেল এটা দুয়োর নেহাতই পয়লা রাউন্ডে হার। দুয়ো যদি দাপুটে হয় সে নিজে সুখী হোক বা না হোক সুয়োর সুখের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে। সুয়োর জোরটা যেমন কাঁচা বয়স, তেমনি দুয়োরও জোরটা হল তার নৈতিক অবস্থান ও পাড়াপড়শির সমর্থন। তাই সে দিনরাত শাপশাপান্ত করে জ্বালা জুড়োতে পারে।

খাটখানা তুই বাগিয়ে নিলি

ওরে সিঁধেল মাগি,

ওতে চেপেই শ্মশানে আজ

যাবি গতরখাগি। (হিন্দি[৬৮০])

আজকে আমার সিঁদুর নিয়ে

খুব তো খেলিস দোল,

পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে

বলব 'হরিবোল'। (গুজরাতি[৬৮১])

বরের কাছে সুয়োর যে আকর্ষণ তাকে অস্বীকার করার পথ খোঁজে দুয়ো।

সাজ বলে সুন্দরী বনে গেলে ডাইনি,

আমিও সতিন জেনো কম রূপ পাইনি। (মারাঠি[৬৮২])

কথাটা সত্যি হতেও পারে, কেননা আরও এক সতিন সম্পর্কে শোনা গেছে—

সতিন যাতে জ্বলে তাই

করে এত সাজ,

পড়শি যাতে দেখে তাই

ঘরে গোছগাছ। (মারাঠি[৬৮৩])

সতিনকে জ্বালানোর আরও এক পন্থা আছে।

মাগির যাতে চোখ টাটায়

মোটকা রুটি সাতটা খায়। (পাঞ্জাবি[৬৮৪])

অবশ্য সতিনের জন্য দুগুণ খাওয়ার ঘটনা বাঙালির[৬৮৫] অজানা নয়। সম্পর্কটাই এমন যে সতিন থাকলে সুখ বলতে কেবল একটাই—তাকে জ্বালানো। এমনকী সতিন থাকলে তো মরেও সুখ নেই!

স্বর্গে দুয়োর নেইকো সুখ,
মর্ত্যে সুয়ো করছে মুখ। (হিন্দি[৬৮৬])

তবে হ্যাঁ, সতিনই যে মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু তা নয়, তাদের চেয়েও বড়ো হল সতিন-কাঁটা (সতিনের ছেলে বা মেয়ে), যাদের সামনে সতিনও 'মন্দের ভালো' হয়ে দাঁড়ায়।

থাকতে হলে সতিন থাক,
সতিন-কাঁটা চুলোয় যাক। (ওড়িয়া[৬৮৭])

এত শয়তান সতিন-কাঁটা
ওর চে' বরং ভালো তো মা-টা। (হিন্দি[৬৮৮], তুলনীয় বাংলা[৬৮৯])

সতিন মাগির পুত
সবটাই গু-মুত। (ওড়িয়া[৬৯০])

আহা আহা বলছ ও কী!
সতিন-কন্যা বনবে সখী? (কাশ্মীরি[৬৯১])

হে ভগবান, চাইলে দিও
সাতটা যমের ঘরে,
একটাও না ছেলে যেন
সতিন পেটে ধরে। (ওড়িয়া[৬৯২])

কিন্তু কাঁটাদের ছেড়ে সতিনদের কথাই হোক। যে-সব লোক দোসরা বউ আনে আগের জনকে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের সমস্যাটা একরকম। যেমন—

টাটকা মাগ আন যদি মাগ তাড়িয়ে—
ডেকচি থেকেই তুলে খাবে আগ বাড়িয়ে। (কন্নড়[৬৯৩])

আগের বউটা ছিল ভালো এর চেয়ে—
জাগালে তবু তো নিজে নিজে নিত খেয়ে। (কন্নড়[৬৯৪])

কিন্তু যেসব লোক একই সঙ্গে দুটো বউ নিয়ে ঘর করে এবং দুই বউই যদি কমবেশি ঝাঁঝালো হয় তা হলে ওদের দিন খুব একটা সুখে কাটে না।

দুই নৌকায় ভাতার—
সামনে অকূল পাথার। (উর্দু[৬৯৫])

দুই কুকুরের শিকার যেন শুয়োর—
দুই-মেগো না পালাতে পায় দুয়োর। (পাঞ্জাবি[৬৯৬])

দুয়ো টানে গোঁফ, সুয়োটা ল্যাঙট—
দুজনে পাল্লা দিয়ে,
দুই-মেগো বলে আর যেন কেউ
করে নাকো দুটো বিয়ে। (হিন্দি[৩২৭])

রুই থাকতেও এনেছিল সে যে কাতলা
চোখ হারাল, দাড়ি হল তার পাতলা। (হিন্দি[৩২৮], অংশত কাশ্মীরি[৩২৯])

জোড়া বউ যে-যে ঘরে
আপনি আগুন ধরে। (তামিল[৪০০])

দুয়ের জ্বালায় আগুন সারা ঘরে,
আশায় থাকি উনুন যদি ধবে। (হিন্দি[৪০১])

দুই বউ দুটি রিপু,
উনুনে তাইতো দি ফুঁ। (অংশত রাজস্থানী[৪০২] ও গুজরাতি[৪০৩],
তুলনীয় বাংলা[৪০৪])

দু-দুটো বউ এনেও মুদি
পড়ে গিয়েছে তো একা,
কাজের সময় একটারও যে
পায় না মুদি দেখা। (কন্নড়[৪০৫])

একটা হলে লক্ষ্মী,
আরেক মানেই ঝক্কি। (কাশ্মীরি[৪০৬])

একটা বোয়ে কম তো পড়ে,
দুটো হলে নিত্যি লড়ে। (মলয়ালম[৪০৭])

জোড়া-বোয়ের কেমন জ্বালা?
ছারের কামড় রাতের বেলা। (কন্নড়[৪০৮])

তা নয় বোঝা গেল যে, সারারাত ধরে ছারপোকা কামড়ালে যে-কষ্টটা হয় তা-ই সর্বক্ষণ ভোগ করছে দুই-মেগোরা। কিন্তু রাত্রে ওরা দুটো বউকে সামাল দেয় কী করে?

একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে—

দুই বউয়ের বর মানে
পাশা খেলার ঘুঁটি,
পড়ে যেমন দান তাদের
তেমনি বনে জুটি। (উর্দু[৪০৯])

কিন্তু বলতে নেই, অন্যরকম খবরও উড়ে আসে।

দুই ভাতারের মাগ মানে
পাশা খেলার ঘুঁটি,
পড়ে যেমন দান তাদের
তেমনি বনে জুটি। (উর্দু[৪:১০])

তবে এসব কথাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মানে হয় না। সতী-সাবিত্রীর দেশে এসব আর কটা হয়! বরং যার কপালে যেমন জুটেছে, পছন্দ হোক না হোক তাকে নিয়েই কাজ চালিয়ে যাওয়ার খবরই তো বেশি মেলে। এদের অনেকেরই কাছে পরপুরুষের ভালোবাসা বেনোজলের বেশি কিছু নয় (মলয়ালম[৪:১১])। এমনকী কুঁজো বরের মধ্যেও এরা নিজের মতো করে সান্ত্বনা খুঁজে নেয়।

হোক সুন্দর পরপুরুষ
সে তো দূরের ঢেউ,
আমার কুঁজো আদর করে,
করবে তেমন কেউ? (বিহারি[৪:১২], অংশত হিন্দি[৪:১৩])

একনিষ্ঠতা রীতিমতো অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

চলে না তার বরকে ছাড়া,
যদিও জানে হতচ্ছাড়া। (হিন্দি[৪:১৪])

বরেদের ক্ষেত্রেও তা-ই।

তোমার সঙ্গে বনে না,
তোমাকে ছাড়া চলে না। (মারাঠি[৪:১৫])

পছন্দ নয় চায় সে তবু ধুমসিকে,
ধুমসি ছাড়া আসে না তার ঘুমটি যে। (গুজরাতি[৪:১৬])

'ধুমসি'-র জায়গায় 'কানি' হলেও (গুজরাতি[৪:১৭]) তা-ই।

আবার এমন প্রাজ্ঞ দম্পতিরও দেখা মেলে যারা পরস্পরকে পছন্দ না করলেও সার কথাটা জেনে গেছে যে দাম্পত্য কলহে কোনও লাভই নেই।

ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হলে
পড়শিরা পায় অবকাশ,
বর-বউতে ঝগড়া হলে
নিজ ভূমেই পরবাস। (অসমিয়া[৪:১৮])

চার

আমরা জানি যে আদর্শ বউদি-দেওরের মধ্যে সম্পর্কটা মধুরই হয়। আর, আদর্শ ভাদ্দরবউদের তো ভাশুরদের পায়ের পাতার বেশি কিছু দেখাই বারণ। এমনকী আদর্শ ভাশুরদের কাছে তো ভাদ্দরবউরা কন্যাস্থানীয়ও (হিন্দি[৪১৯])।

কিন্তু ব্যভিচার যদি ঘটারই থাকে, ঘরের বউদের ক্ষেত্রে তা দেওর-ভাশুরদের সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একদিকে দেওর-বউদিদের নৈকট্য যেমন একটা কারণ, ভাশুর-ভাদ্দরবউদের মধ্যেকার দূরত্বও তা-ই। ওরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলে বলে "ওদের মোলাকাত এত ক্ষণিকের জন্য হয় যে ভাদ্দরবউরা ঘোমটা টানার সময়টুকুও পায় না (অসমিয়া[৪২০])।" এবং এই ক্ষণিকের ঝলকগুলোই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কেননা বহু অঘটনের মূলেই থাকে "পুরুষের দৃষ্টি আর নারীর চলন (মারাঠি[৪২১])।"

তা ছাড়া কোনও কোনও মেয়ে নিজের দেওর-ভাশুরদের পরপুরুষ বলে নাও মনে করতে পারে। বরের পাশে বসিয়ে ভাবতেও পারে—

একই মায়ের পেটের ভাই—
এটিও যা সেটিও তা-ই। (হিন্দি[৪২২])

কিংবা তারা নিয়তির নির্দেশও পেয়ে থাকতে পারে।

টিকটিকিটা দেয়াল থেকে
করে উঠল "টিকটিক!—
তোমার পক্ষে ভাশুরটার
খাটে ওঠাই হবে ঠিক।" (তেলুগু[৪২৩])

এসব শুনে মেয়েরা রে-রে করে উঠে বলতে পারে—যত দোষ কি মেয়েদের, আর পুরুষেরা সব ভীষ্ম!

না না না, তা কী করে হয়! অবশ্য অনেককেই তেজ দেখিয়ে বলতে শোনা যায়—"ভাই/দাদা আমার বলে কি তার বউও আমার হবে (কন্নড়[৪২৪])?" কিন্তু আবার এমন সঙ্কল্পের কথাও শোনা যায়—

বউদিকে যদি না-ই পাই
কাশীতেই গিয়ে নেব ঠাঁই। (তামিল[৪২৫])

অর্থাৎ বউদি ছাড়া তার দুনিয়ায় কোনও নারীই নেই, কেননা—

যারই জোটে না নারী
বনে সে ব্রহ্মচারী। (গুজরাতি[৪২৬])

এখানে হয়তো ব্যাপারটা নেহাতই একতরফা, কিন্তু প্রবাদের জগতে অন্যত্র এমন ছবিও পাওয়া যায় যেখানে বউদি তার বুকে শুধু খড় দিয়ে বানানো একটা কাঁচুলি পরে এসে বলছে—"বলো ঠাকুরপো, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে (হিন্দি[৪২৭])।"

ওদিকে এমন ভাদ্দরবউদের খবরও মেলে যাদের দুনিয়ায় ভাশুর ছাড়া কোনও দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়—

ভাশুর বনলে ভীষ্ম
তারা হয়ে যাবে নিঃস্ব। (অংশত পাঞ্জাবি[৪২৭])

তবে হ্যাঁ, ভাশুর-ভাদ্দরবউয়ের ব্যাকরণসম্মত সম্পর্কের খবরও প্রবাদের জগৎ থেকে কম পাওয়া যায় না। এমনকী এমন মেয়েরও খবর পাওয়া যায়, যে অতি বড় বেহায়া হয়েও ভাশুরকে ঠিকই সমীহ করে চলে।

হট্টমেলায় ভূতের নেত্য নাচে,
ভয়েই মরে ভাশুর দেখে পাছে। (তেলুগু[৪২৮])

আবার এমন আজব সম্পর্কেরও খবর পাওয়া যায় যেখানে ভাদ্দরবউ ভাশুরকে একা পেয়ে ভুরু নাচিয়ে বলে বসল—"কী হে বকচণ্ডী ভাশুর ঠাকুর?" এবং উত্তরে ভাশুরটি জিজ্ঞেস করল—"কে, অন্ধ শালি নাকি (তেলুগু[৪২৯])?"

আবার অন্যত্র অন্যরকম উত্তরেরও খবর পাওয়া যায় এবং সেটা ভাদ্দরবউটির শহরপ্রবাসী বরের কাছ থেকে।

দু-বছর দেশে যায়নি বেচারা
ব্যস্ত জোটাতে রুটি।
গত মাসে ছেলে হয়েছে যে তার
এবার নেবে সে ছুটি। (হিন্দি[৪৩০])

না, এসব জিনিসের ময়না তদন্ত করার দরকার নেই। তবে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমরা সবাই জানি—

ঘোড়া বোঝে ছিপটি-চাবুক
বলদ পাঁচনবাড়ি,
ভালো মানুষ মুখের ভাষা
চোখের ভাষা নারী। (হিন্দি[৪৩১])

এখন প্রশ্ন হল, শ্রীযুক্তর চোখের ভাষা পড়ে শ্রীমতী কি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিল না আপত্তি জানিয়েছিল? মুখের সে-ভাষা 'ভালোমানুষ' কি বুঝেছিল, না শ্রীমতীর ওপর গরু-ঘোড়ার ভাষা প্রয়োগ করেছিল?

মেয়েরা বলবে শেষেরটাই করেছিল, কেননা তারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে—

এই দুনিয়ায় সব মেয়েরাই
থাকতে পারে সতী,
গুন্ডাগুলোর হামলা থেকে
বাঁচতে পারে যদি। (হিন্দি[৪৩২])

তবে হ্যাঁ, জোর খাটানোর খবরও যে পাওয়া যায় তা চাপা দিয়ে লাভ নেই। এটা এক বালিকাবধূ সম্পর্কে।

বর যদি বা ছাড়ে—
শ্বশুর ব্যাটার হাত থেকে বউ
পার পেতে কি পারে? (তেলুগুর[৪৩৩] অংশ)

অ্যাঁ, অ্যাঁ, এসবের মধ্যে শ্বশুর আসে কোত্থেকে?

আসে আসে, এই দেখুন না—

চার বউকে দিচ্ছিল তো শ্বশুর পাহারা—
গর্ভবতী করে দিল কে বা কাহারা। (মারাঠি[৪৩৪])

কী, বেনিফিট অফ ডাউট দেবেন? কিন্তু আরেক শ্বশুরকে দেখুন।

সারাদিনেও ছেলের বোয়ে
মেটে না তার আশ,
স্বপ্নে দেখে কেউ সে মেয়ের
করছে সর্বনাশ। (তামিল[৪৩৫])

এরপরও আরও আছে, আরও—

একেই বলে কলি—
নাতনি দাদুর কুদৃষ্টির বলি। (হিন্দি[৪৩৬])

বলাই বাহুল্য, এত সব বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই থেকে থাকে, বউদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শাশুড়িরাও নিশ্চয়ই বলি হওয়ার ভয়ে দিন কাটায়।

বউ-শাশুড়ির মাঝে থাকে
এগারোটা ভাতার,
'সতী' নামটি রাখতে তাদের
সামলাতে হয় কাতার। (অসমিয়া[৪৩৭])

কজন শেষ পর্যন্ত সতীত্ব বজায় রাখতে পারে তা বলা শক্ত। কেননা একটি ঋষিবাক্যে শোনা যায়—"যদি আগুন শীতল হয়, চাঁদের দাহনশক্তি থাকে এবং সমুদ্রের জল সুস্বাদু হয় তবেই নারীর পক্ষে সতী থাকা সম্ভব (সংস্কৃত[৪৩৭])।" এও শোনা যায়—

ন-লক্ষ তারার মাঝে একটি নিশাপতি,
সারা শহর ছেঁকে পাবে একটিমাত্র সতী। (রাজস্থানী[৪৩৮])

এর সবটাই যে জোর-জবরদস্তির ফল তা বলা যায় না, বরং উলটোটাও হতে পারে। কেননা, অনেক মেয়েই স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী হয় তাদের ন্যালাখ্যাপলা বরেদের জন্যই, যারা বোঝে না—"গরু ও জরুর দেখভাল নিজেদেরই করা উচিত (ওড়িয়া[৪৩৯])" এবং সেটা শক্ত হাতে। কেননা—

কমজোরিকে কেউ কখনও
করবে নাকো রেয়াত,
খেত বল কি বউ বল সে
হবেই হবে বেহাত। (বিহারি[৪৪০])

এবং বেহাত হয়ে গেলে?

তরোয়াল বা গিন্নি যদি
পরের হাতে পড়ে—
তারই হয়ে লড়ে। (বিহারির[৪৪১] অংশ, অংশত কাশ্মীরি[৪৪২])

দেখা যাচ্ছে "মেয়েরা ধনুকের মতোই বাঁক খেতে পারে (হিন্দি[৪৪৩])।" তবে শত্তুরে বলে বাঁক নাকি সব মেয়েই খেতে চায়, পারে না নেহাতই ভয়ে। সমস্যাটা হল—

হতে তো চায় খানকি,
সইবে বরের মার কি? (তামিল[৪৪৪])

তাই সবসময় বউকে শাসনে রাখতে বলা হয়।

শক্ত করে আটা ঠাস,
টেনে রাখিস মাগের রাশ। (মারাঠি[৪৪৫])

কিন্তু বউয়ের রাশ তখনই টেনে রাখা যায় যদি বরের গোড়ায়-গলদ না থাকে।

'মরদ' হলে ড্যাকরা—
যেতাম নাকি ডাকলে আমায়
হতচ্ছাড়া স্যাকরা! (তেলুগু[৪৪৬])

তবে অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতিই এমন হয় যে বরেরা সেখানে নিরুপায়। লোকে বলে—

সেনার বউ, তাঁতির জুতোর
ব্যবহার নেই কোনো,
এমনি এমনি পড়ে থেকেই
হয়ে যায় পুরোনো। (হিন্দি[৪৪৭])

তাই আশপাশের পুরুষেরা প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসে। কতটা সফল হয় জানা নেই, তবে অন্য একটা পেশার ক্ষেত্রে ফিশফাশ শোনা যায়—

গাড়োয়ান যত খাটে
বউ তত ভাড়া খাটে। (মারাঠি[৪৪৮])

গাড়োয়ানরা প্রায়ই বাইরে রাত কাটায় বলে তাদের বউদের নামে এই অপবাদ। কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়া কারও চরিত্র হনন করা ঠিক নয়। সেইজন্যই শাস্ত্রে বলে—

চোর ধরবে বমাল,
খাটে ধরবে ছেনাল। (হিন্দি[৪৪৯])

ধরা শক্তও নয়, কেননা—

চাইলে তুমি নিতে পার
ছদ্মবেশ অনেক,
কিন্তু বড়ো কঠিন ধরা
সতীসাধ্বীর ভেক। (রাজস্থানী[৪৫০])

তা ছাড়া লোকে বলে, যে-সব বউ পরপুরুষের স্বাদ একবার পেয়ে গেছে তাদের চলনবলন, চাহনি, হাসি এমন পালটে যায় যে দেখলেই নাকি চিনতে পারা যায়।

জাত-ছেনালের হাসি দেখেই
চিনে ফেলে লম্পট,
সতীর তেজে পোড়ার আগেই
দেয় তারা চম্পট। (মারাঠি[৪৫১])

এমনকী নিরীহ লোকেরাও ওদের স্পেশাল হাসি দেখলে যা বোঝার বুঝে যায়।

বিকশিত হল নারীর দন্ত—
পুরুষ বুঝল কোথায় অন্ত। (হিন্দি[৪৫২])

আর এ কথা কে না জানে—

চোরের যেমন কাশি
নারীর শত্রু হাসি। (হিন্দি[৪৫৩], তুলনীয় বাংলা[৪৫৪])

শত্রু, কেননা ওই হাসির টানেই লম্পটেরা জড়ো হয়ে বউদের সাতভাতারি করে তোলার চেষ্টা করে। এবং এটা কে না জানে—

আইবুড়ো আর বেওয়ার মতো
সাতভাতারিও কাঁদে—
জড়িয়ে ভীষণ ফাঁদে। (রাজস্থানী[৪৫৫])

অমুক বউয়ের যে ইদিক-সিদিক বাই আছে এ-খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না। রাস্তায় বেরোনো মুশকিল হয়ে পড়ে। নানান মন্তব্য উড়ে আসে—

আরে ছেনাল যাচ্ছ কোথায়,
খোঁজ করছ 'রাজা'-র?
ভুলেই গেছ এদিকে নয়,
উলটো দিকে বাজার। (বিহারি[৪৫৬])

মেনির আছে সাতটা হুলো,
জানে না সে জ্বালতে চুলো। (হিন্দি[৪৫৭], অংশত তেলুগু[৪৫৮])

দিনের বেলায় পুরো সতী,
রাত্রে গঙ্গা-ভাগীরথী। (মারাঠি[৪৫৯])

জানি না অত পবিত্র নদী কীভাবে অসতীর প্রতীক হয়ে উঠল। আরেকটি পবিত্র বস্তুও অসতীর ডেরার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

যে বাড়িতে ছেনাল বিবি—
বাড়ি তো নয় গোবর-ঢিবি। (হিন্দি[৪৬০], গুজরাতি[৪৬১])

এদের মায়েরাও ছাড় পায় না।

ধনুর আছে একটা মেয়ে,
সাত সাতটা জামাই—
ধনুর অনেক কামাই। (গুজরাতি[৪৬২])

এসব শুনে সব মা-ই যে লজ্জায় এক হাত জিভ বের করে তা নয়, অনেকে এর জন্য বেশ গর্বিতও হয়। কেউ কেউ নাকি বলেও—

দেখো আমার মেয়ের এলেম—
সব গলিতে জামাই পেলেম। (মারাঠি[৪৬৩])

তবে ওরা হল একদম অন্য জগতের মানুষ। যে-সব মেয়ে নেহাতই শখের কারবারি, এত টিটকিরি সয়ে তাদের পক্ষে গাঁয়ে টেকা দায় হয়ে পড়ে। তাই প্রায়ই বউ পালানোর খবর পাওয়া যায়। কথায় বলে "পালানো বউ শত শত গ্রাম উজাড় করে (গুজরাতি[৪৬৪])।" সত্যি সত্যি কতটা কী করে বলা মুশকিল, তবে কিছু পালানো বউয়ের নিজেদেরই বিপাকে পড়ার কথা শোনা যায়। যেমন—

বলল রাজা 'করব তোমায় রানি',
বরকে ছেড়ে পায় না হালে পানি। (তামিল[৪৬৫])

এবং তারপর একদিন হয়তো দেখা যায়—

গাল বসে গেছে
ছেঁড়া শাড়ি তার পরনে—
এল সে আবার
আগের বরের শরণে। (মারাঠি[৪৬৬], অংশত কন্নড়[৪৬৭])

এসব ক্ষেত্রে কোনও কোনও বর হয়তো বা বউকে ফিরিয়ে নিতেও পারে, বিশেষ করে বউ যদি বলে—

অনেক ঠেকে বুঝেছি আমি—
তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ স্বামী। (মারাঠি[৪৬৮])

কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনও বউ যদি তার বরকে কোনওদিন এই কথাটা বলে—?

আবার বিবাহ করতে যাচ্ছি নাথ,
মোড়টা অবধি এগিয়ে দাওনা,
ধরোনা আমার হাত! (গুজরাতি[৪৬৯])

কী? মনে হচ্ছে লাখে একজন বরও রাজি হবে না?

কিন্তু প্রবাদের জগতে অন্তত তিন-তিনটে ক্ষেত্রে (গুজরাতি[৪৭০, ৪৭১, ৪৭২]) বরেদের রীতিমতো নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে বউদের ফেয়ারওয়েল দেওয়ার খবর মেলে।

এদিকে আরেকটি বরের সংবাদ যা পাওয়া যাচ্ছে—

পেটের দায়ে সে বউকে বেচতে
গিয়েছে রাজার কাছে—
রাজা বলে তাকে "ধার দেনা বউ",
পয়সাটা যাতে বাঁচে। (হিন্দি[৪৭৩], তুলনীয় হিন্দি[৪৭৪])

প্রবাদের জগৎ থেকে রকমারি বেউলে-সতীরও খবর আসে।

নিখাদ সতী আমি
জানেন প্রথম স্বামী। (তেলুগু[৪৭৫])

পতিভক্তির প্রমাণ চাও তো
হাঁটব হুতাশনে,
হে প্রাণনাথ, তুমি আমার
জুতোটা দাও এনে। (তেলুগু[৪৭৬])

দিনটা কাটায় সাত নাগরের কাছে,
রাত্তিরে সে বরের উকুন বাছে। (কন্নড়[৪৭৬*])

অসতী নামের ছাপটা আমার
বেশ পুরোনো হল,
এবার থেকে তোমরা আমায়
সতীসাধ্বী বোলো। (মারাঠি[৪৭৭])

পাওয়া যায় সিনিক মেয়েদেরও খোঁজ যারা 'সতী' নাম বা পতির শরণের জন্য আর লালায়িত নয়। এরা নির্দ্বিধায় বলতে পারে—"মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলব তার আবার লগ্ন কীসের (তেলুগু[৪৭৮])?" এদের মধ্যে যাদের এয়োর চিহ্ন চুড়ি, তাদের কাছে সেগুলো এমন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যে এমন কথাও বলতে শোনা যায়—

আপনিই ভেঙে গেল চুড়িগুলো
হাতদুটো হল হালকা,
প্রভু রাম তুমি ভালোই করলে
এ বাঁধন ছিল আলগা। (রাজস্থানী[৪৭৯])

আর, লম্পটদের বউদের কাছে বিয়ের অর্থটাই বা কতটা বাকি থাকে?

লোচ্চার বউ বোঝে না ফারাক—
কাকে বলে বিয়ে, কাকে বা তালাক। (উর্দু[৪৮০])

এরা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয় এবং করে নিতে থাকে। কেউ কেউ জুটি পালটাতে পালটাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, একদিন হয়তো দেখা গেল "ধোপার বউ তালাক দিচ্ছে নাপিতকে (তেলুগু[৪৮১])।" লাজ-লজ্জার পরোয়া ওরা করে না, ওরা জানে সতী হলে জীবনে কিছু এমন হাতি-ঘোড়া হয় না, বরং মানসচক্ষে দেখতে পায়—

সতীর ঘরে নেইকো বাতি,
জাত-অসতীর দুয়োরে হাতি। (মারাঠি[৪৮২], অংশত ওড়িয়া[৪৮২*])

সতীর গায়ে শুধুই ত্যানা
খানকি পরে হ্যানাত্যানা। (হিন্দি[৪৮৩])

মাগের গায়ে কানি
মাগির তো জামদানি। (বিহারি[৪৮৪])

রামনামে পায় ঘাড়ধাক্কা
পাছা দোলালে আয় পাক্কা। (হিন্দি[৪৮৫])

অসতীরা আয়েশ করে
সতীলক্ষ্মী শুকিয়ে মরে। (সিন্ধি[৪৮৬])

খবর আসে দেবদাসীদের কাছ থেকেও। ভারতের একটি অঞ্চলে য়েলেম্মা নামের এক দেবীকে কেন্দ্র করে একটি প্রথা গড়ে উঠেছে, যার দৌলতে দেবদাসী সমাজের মেয়েরা রজস্বলা হলেই প্রথমে তাদের কৌমার্য হরণ করার অধিকার পায় গ্রামের মাথারা। বাধ্যতামূলক বেশ্যাবৃত্তি করা এইসব মেয়ের ঘাতকও য়েলেম্মা, ত্রাতাও য়েলেম্মা।

মেয়ে হয়ে আমি
কত জ্বালা সয়ে এলাম মা!
এবার আমায়
মরণই দাও গো য়েলেম্মা। (কন্নড়[৪৮৭])

পাঁচ

স্বামী-স্ত্রীর পরেই যে-সম্পর্কটা সবচেয়ে বর্ণময় তা হল শাশুড়ি-বউ। ওই একটি বউই যা বলেছিল "ডালের মধ্যে মশুরি, মানুষের মধ্যে শাশুড়ি", নয়তো প্রবাদের জগতে নিজের শাশুড়ি সম্পর্কে প্রায় কোনও মেয়েকেই সুখ্যেত করতে শোনা যায় না। তাও সন্দেহ হয় ওই বাঙালি বউটির মশুর ডালে অ্যালার্জি ছিল কিনা। কিংবা বউটি হয়তো স্বামীর সঙ্গে দূরে কোথাও থাকত। সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। হয় উলটোটা হলে।

যে-বউ থাকে কাছে,
দূর গাঁয়ে যে ছেলে—
তাদের মনের সাথে
মন কি কারও মেলে? (কন্নড়[৪৮৮])

আরও এক-আধটা সদ্ভাবের কথা শোনা যায় বটে, তবে সেখানে একটা না একটা 'কিন্তু' থাকে। যেমন—

শাউড়ির সাথে
বউড়ির যদি পটে,
মাঝে আসে কারা,
বুদ্ধি নেই কি ঘটে? (গুজরাতি[৪৮৯])

উত্তরে বলতে হয় 'যদি'-র কথা নদীতে।

আরেকটা শোনা যায়—

সৎ-শাশুড়ির সঙ্গে যদি থাকে ভাব,
ক্ষীর-মিছরি হবে তাতে বোয়ের লাভ। (ওড়িয়া[৪৯০])

সে তো হবেই, কেননা শত্রুর শত্রু = বন্ধু।

তবে ভালো করে খুঁজলে দু-একটা সুখবর কি পাওয়া যাবে না? কিন্তু সে-সব ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে প্রবাদের জগতে সারা ভারতের বউদের কণ্ঠে কেবল এই স্লোগানটাই শোনা যায়—শাশুড়িরা নিপাত যাও। দেখা যায় সবাই বধূকণ্টকী শাশুড়িদের মরার অপেক্ষায় আছে এবং মরছে না দেখে অধৈর্য হয়ে পড়ছে—

মরে না যে বউকাঁটকি!
আদৌ চুকবে পাট কি? (তামিল[৪৯১])

যুবতী শাশুড়ি মরে না,
বউটার হাল ফেরে না। (গুজরাতি[৪৯২])

তবে এ কথা সবাই জানে যে, "শাশুড়ির একশো দিন আর বউয়ের একদিন (গুজরাতি[৪৯৩], সিন্ধি[৪৯৪])", কিন্তু প্রশ্ন হল, দেরিতে হলেও সেই দিনটা যখন আসে, প্রবাদের বউদের চোখ থেকে কি এক ফোঁটাও জল বেরোয় না?

হ্যাঁ, কখনও কখনও বেরোয় বটে।

শাশুড়ি গেল মুক্তি পেল,
আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এল। (মারাঠি[৪৯৫])

কাটছিল সে যখন পেঁয়াজ
হিক্কা শুনতে পেল,
চোখটা ফেটে হঠাৎ বোয়ের
জল বেরিয়ে এল। (মারাঠি[৪৯৬])

না হয় বউটি শাশুড়ির অন্তিম মুহূর্তে রান্নারই আয়োজন করছিল, তার মানেই কি চোখের জলটা শোকের নয়?

হলেও বা কী, লোকে তো সেটাকে মায়াকান্না বলেই ধরে নেবে। কেননা শাশুড়ি মরলে বউয়ের কান্না পাওয়াটাই নাকি অবিশ্বাস্য (মলয়ালাম[৪৯৭])।

তা, তেমন তেমন বউয়ের খোঁজ পাওয়া যায় বটে, যারা এতে কান্নার কী আছে সেটাই বুঝে উঠতে পারে না। রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ে বলে—"রোগে পড়িনি, ব্যথা-বেদ্‌না নেই, কোনও উপলক্ষও নেই—খামখা কাঁদতেই বা যাব কেন (কাশ্মীরি[৪৯৮])!"

এর থেকেই বোঝা যায় এ কান্না কত বিরল। তাই তো লোকে বলে—

শাশুড়ির শোকে কান্না—
দামে তা হিরে কি পান্না। (হিন্দি[৪৯৯])

তবে বউরা যে একেবারেই শোকের কান্না কাঁদে না সে কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। হ্যাঁ, কেউ কেউ কাঁদে, তবে একটু রয়ে-সয়ে। এক বাঙালি[৫০০] বউ তো কান্নাটা শুধু দু প্রহরের জন্য মুলতবি রেখেছিল, কিন্তু অন্যত্র কেউ দু মাস (মারাঠি[৫০১]), কেউ ছ মাস (তামিল[৫০২], কন্নড়[৫০৩]), কেউ বা এক বছর (গুজরাতি[৫০৪])।

তবে, লোক দেখানো ব্যাপার বলেও তো কিছু একটা আছে, বউদের জন্য শোক পালনের কোনও প্রথাই কি নেই?

আছে হয়তো বিস্তর, তবে প্রবাদের জগৎ থেকে শুধু একটারই খবর পাওয়া যায়। এমনিতে মঙ্গলবার চুল খুলে রাখতে নেই এবং হাত ভরে চুড়ি পরতে নেই, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম ভাঙাটাই নিয়ম।

মারা যায় যদি মা
শোক করো এলোকেশে,
মরে যদি শাশুড়ি
চুড়ি পরো হাতে ঠেসে। (বিহারির[৫০৫] অংশ)

কেন? কেন? বউ না হয় শোক না-ই করল, তাই বলে সাজগোজ করে ফুর্তি করবে?

তা, করতেই পারে। এ তো শুধু আপদ বালাই দূর হওয়া নয়, এতে প্রাপ্তিরও ব্যাপার আছে।

শাশুড়িকে ওরা নিয়ে গেল—
ঘিয়ের বোয়েম হাতে এল। (মারাঠি[৫০৬])

বোঝাই যাচ্ছে এ বউটা ছেলেমানুষ, নয়তো শুধু ওইটুকু হাতে পেয়েই খুশি হত না। সব মেয়েরই একটা স্বপ্ন থাকে যে একদিন গোটা সংসারটার 'চাবিকাঠি' তার আঁচলের খুঁটে আসবে, সে হতে পারবে "একলা ঘরের গিন্নি!"[৫০৭] সুতরাং তেমন তেমন বউ হলে শাশুড়ি মারা গেলে খুশি হয়ে বলতেই পারে "সংসারটা হাতে এল (মারাঠি[৫০৮], গুজরাতি[৫০৯])।"

আর তেমন তেমন বধূকন্টকী শাশুড়ি হলে তো তাকে মরতে দেখেও খুশি হবে যে-কোনও বউ।

বউকাঁটকি তলিয়ে গেছে
তার শাড়িটা ভাসে,
বউটা ভয়ে ককিয়ে ওঠে
ফেরত যদি আসে! (গুজরাতি[৫১০])

সত্যিই যদি ফেরত না আসে, কোনও ভাগিদার না থাকলে ঘিয়ের বোয়েম সমেত গোটা রাজ্যটা বউয়ের হাতে চলে আসে। তাই তো বলা হয়—

বধূবিহীন শ্বশ্রূমাতা বড়ো ভাগ্যবতী,
শ্বশ্রূমাতা না থাকলে বধূ বিত্তবতী। (তেলুগুর[৫১১] অংশ)

এইজন্যও বহু মেয়েই চায় তাদের এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হোক যাদের মা-বাবা নেই।

চলবে আমার বর যদি হয় হাবা,
এইটুকু চাই থাকবে না মা-বাবা। (হিন্দি[৫১২], অংশত সিন্ধি[৫১৩])

তবে ক'জনের কপালে আর অমন 'নির্ঝঞ্ঝাট পাত্র' জোটে, শাশুড়ির হাতে তাদের পড়তেই হয়। এবং তেমন তেমন শাশুড়ি হলে তো—

মুখটা খোলার সাহস তো বউ
কেবল তখনই পায়—
শাউড়ি যখন ঘর ছেড়ে গিয়ে
ঝাঁটটা দেয় দাওয়ায়। (মারাঠি[৫১৪])

এরকম শাশুড়িরা যদি লম্বা সময়ের জন্য বাইরে যায়, বউদের আর দেখে কে!

শাউড়ি গেছে বাপের বাড়ি
বউ পড়েছে ধাঁধায়—
খাবার আছে কাঁড়িকাঁড়ি
কী ছেড়ে সে কী খায়! (হিন্দি[৫১৫])

এমনকী কিছুক্ষণের জন্যও শাশুড়িরা বাইরে বেরোলে মুক্তি।

বউকাঁটকি শাউড়ি গেছে
বাগদি পাড়ায় চরতে,
এইটুকু হাঁপ ছাড়তে পেরে
বউটা গেছে বর্তে। (তেলুগু[৫১৬])

শাশুড়ি গিয়েছে বাইরে,
আর কারও ভয় নাই রে! (উর্দু[৫১৭])

শিবরাত্রি—হবে শাশুড়ির
মন্দিরে রাত কাবার;
বউ বলে "জয় বাবার!" (হিন্দি[৫১৮], অংশত গুজরাতি[৫১৮*])

জয় বাবা ভোলানাথ!
শাশুড়ির মতি তোমাতেই থাক—
পেট ভরে খাই ভাত। (গুজরাতি[৫১৯])

অ্যাঁ, পেট ভরে খেতেও দেয় না বউকে!

নাও দিতে পারে, এটাও তো র‍্যাগিয়েরই অঙ্গ। আর পরিবারটা হতদরিদ্র হলে তো পেটেই আগে হাত পড়বে। বউ যদি সহ্য করতে না পেরে মুখ ফুটে বলেও ওর খিদের কথা, ওকে শুনতে হতে পারে—

খুব হয়েছে নোলা!
এই নে খা নোড়া। (তেলুগু[৫২০])

অথচ ভালো করে বউ খেলে শাশুড়িরই নাতি-নাতনিদের স্বাস্থ্য ভালো হত।

বাছুরে যা দুধ টানে,
বউ যতটুকু খায়—
কে বলে তা বৃথা যায়? (পাঞ্জাবি[৫২১])

খাওয়ার মতোই বউয়ের শোয়া নিয়েও কোনও রকম বখিলি করতে পারে শাশুড়ি। যেমন—

শাশুড়ির উড়ুনিটা
কবে হয়ে গেছে ত্যানা,
তা-ই পেতে করা হল
বউটার বিছানা। (হিন্দি[৫২২])

কিন্তু বউদের কি ঠান্ডা লাগে না?

ঠান্ডা লাগে সবার,
বউ এ গ্রহের বার! (গুজরাতি[৫২৩])

এ আর এমনকী! তেমন তেমন অঞ্চলে তেমন তেমন ক্ষেত্রে তো পরনের কাপড় নিয়েও টানাটানি হয়।

একটাই শাড়ি আছে
শাশুড়িই সেটা পরে,
বউটি ন্যাংটো হয়ে
বন্দিই থাকে ঘরে। (হিন্দি[৫২৪], অংশত গুজরাতি[৫২৫])

তবে এটা দারিদ্রসীমার অনেক নীচের ব্যাপার। সেখানকার মরণ বাঁচন সমস্যার মধ্যে এরকম হতেই পারে। কিন্তু অবস্থা মোটামুটি হলেও হয়তো বউকে দেখা যায়—

পরবাসী হলে বর
শুতে পায় ঢেঁকিঘর। (মারাঠি[৫২৬])

কিংবা শাশুড়িকে দেখা যায়—

খেতে ব'সে একসাথে—
মুখে যা রুচল না
তোলে বউয়ের পাতে। (পাঞ্জাবি[৫২৭])

এমনকী এ কথাও শোনা যায়—

বাড়িতে প্রথম গরু আসে যার
খেতে দেয় বার বার,
নতুন বউকে উঠতে বসতে
শাশুড়িরা দেয় মার। (ওড়িয়া[৫২৮])

অবশ্য অনেক বউয়ের আগে থাকতেই জানা থাকে—

শ্বশুরবাড়িতে যাই
সইতে আখমাড়াই। (কন্নড়[৫২৯])

অনেক শাশুড়িরই নীতি নাকি এই—

বউটাকে সারাদিন সমানে খাটাও,
পদে পদে ভুল ধরে কেবলই চাঁটাও। (হিন্দি[৫৩০])

তবে সব শাশুড়ি তো সব বউকে এটা করতে পারে না, তাই বেশিরভাগই মানসিক নির্যাতনের পথটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। কেউ কেউ কেবলই ফুট কেটে যায়।

যেমন, সারাক্ষণ খেটে খেটে বউ একটু হাঁপিয়ে উঠুক অমনি বলে দিল—

থুতু পড়লে ভেজে,
ফুঁয়ে শুকোয় সে যে,
আহা দেখো থাকে কেমন
ফুলটুসকি সেজে। (মারাঠি[৫৩১])

কিংবা বলল—

দেখে মেয়ের 'ধরো ধরো সখী' ধাত,
কেবলই আমার নিশপিশ করে হাত। (মারাঠি[৫৩২])

একদিন চান বাদ দিল তো—

পুণ্যবতী শুধু নায়
অমাবস্যা পূর্ণিমায়। (মারাঠি[৫৩৩])

একটু জোরে হাঁটুক—

বোয়ের পায়ের দাপে
সারাটা বাড়ি কাঁপে। (গুজরাতি[৫৩৪])

কাজে কারও একটু সাহায্য নিক—

ঠ্যাংভাঙা বউ আগ বাড়িয়ে
দিতে গেল ঝাঁট—
দশজনকে ধরতে হল
ভাঙা পায়ের গাঁট। (রাজস্থানী[৫৩৫], গুজরাতি[৫৩৬])

রান্না একটু খারাপ হোক—

গাই বউয়ের গুণ
পায়েসে যে দেয় নুন। (উর্দু[৫৩৭])

আবার, বউয়ের রান্নার কেউ একটু প্রশংসা করুক—

স্বাদ হল তো ঘিয়ের গুণে
বউটা লাফায় তারিফ শুনে। (রাজস্থানী[৫৩৮], পাঞ্জাবি[৫৩৯])

পান থেকে একটু চুন খসুক—

থকে গেছি বলে বলে
তবু সর ভাসে ঘোলে। (গুজরাতি[৫৪০])

যখন কোনও দোষই খুঁজে পাওয়া যায় না—

দরজা থেকেই বেশ পাওয়া যায় টের
আমার ছেলের বউটা কোন ধাতের। (গুজরাতি[৫৪১], রাজস্থানী[৫৪২],
অংশত তেলুগু[৫৪৩])

ভালো করতে গেলেও বউদের বিপদ।

বসার সময় শাশুড়ির যদি
কাপড়টা যায় সরে,
ইশারা করেও জানালে বউ
দেখবে বিষ নজরে। (তামিল[৫৪৪])

সব ব্যাপারেই ঘোর অসাম্য।

কার পায়ে কার পা-টা লেগেছে
সেটা কোনও কথা নয়,
বউকেই শেষে মাথা নিচু করে
পায়ে হাত দিতে হয়। (গুজরাতি[৫৪৫])

শাশুড়িটা গেলে ধোপার বাড়িতে
কেউ তো করে না সওয়াল,
বউ জানে তার সীমানাটা শুধু
দেয়াল পেরিয়ে গোয়াল। (কন্নড়[৫৪৬])

সারা গ্রাম ঘুরে শাশুড়ি কেমন
খুঁজে এনে দিল গাধা,
বউটা কোথাও যেতে যদি চায়
সদর দোরও বাধা। (কন্নড়[৪৪৭])

এঁটো-কাঁটা নিয়ে বউকে বলল যা-তা,
শেষকালে কিনা নিজেই চাটল হাতা! (তেলুগু[৪৪৮])

শুধু তা-ই নয়, আরও আছে।

গোয়ালার সাথে ঢলাঢলি
বউকে জ্ঞানের কথা বলি। (গুজরাতি[৪৪৯])

লোকে বলে সাতভাতারি, গায় কত কুচ্ছো—
নীতিবাক্য শুনিয়ে কিনা বউটাকে দুষছ! (হিন্দি[৪৫০])

সবই বোঝে বউ, কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই।

কত যে নাটক করে শাশুড়িটা
ঢুকে ঘোমটার তলায়,
দেখে বউয়ের মিষ্টিখানাই
আটকে যাচ্ছে গলায়। (তামিল[৪৫১])

সংসারের কাজে শাশুড়ির ভূমিকা কীরকম?
অনেক সময়ই দেখা যায়—

কাজ সব হয়ে যায়
শাশুড়ি হাত লাগায়। (তেলুগু[৪৫২])

বাংলায় আমরা যে দেখেছি "রেঁধে বেড়ে মল দুয়ো, হাত নেড়ে পরসাল সুয়ো"—সেইরকমই আর কি।

আবার বাংলাতেই[৪৫৩] এক শাশুড়িকে যে আমরা দেখেছি লাউয়ের চেয়ে চালতা কোটা 'সোজা' বলে বুঝিয়ে ওই ঝকমারির কাজটা বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে, সেরকম ঘটনার খবর আরও পাওয়া যায়।

সকাল থেকে মা অনেক খেটেছ
এসো বাছা উঠে এসো,
চরকা না হয় আমিই কাটছি
তুমি যাও গম পেষো। (পাঞ্জাবি[৪৫৪, ৪৫৫], গুজরাতি[৪৫৬], অংশত বিহারি[৪৫৭])

কিন্তু এদের চেয়েও এক কাঠি ওপরে গিয়েছিল রাজস্থানের এক শাশুড়ি, যে খুব আদর দেখিয়ে বউকে বলেছিল—

তুমি মা হলে এ ঘরের
এ বাড়ি তোমারই ভুলো না,
তবে যদি দেখ ঢাকা আছে কিছু
ভুলেও যেন তা খুলো না। (রাজস্থানী[৫৫৮], তুলনীয় উর্দু[৫৫৯])

তবে শ্বশ্রূপ্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে আরেকজন।

চারদিকে ঝুলিয়েছি ঠাকুরের ছবি—
কড়কাব যেদিকেই পা করে শুবি। (হিন্দি[৫৬০])

আবার আরেক রকম প্রতিভা আছে—অন্তর টিপ্পুনির।

খোলে না সে মুখ, নাড়ে নাকো জিভ—
তবু বউটার বুক টিপ টিপ। (হিন্দি[৫৬১])

তবে সব শাশুড়ি তো আর এ টেকনিক জানে না, তাই—

মুখ থেকে যটা কথা বেরোয়,
লক্ষ্য যখন বোয়ের কান
সবকটাই তো মৃত্যুবাণ। (কন্নড়[৫৬২])

আর যে-সব শাশুড়ি কোনও টেকনিকই জানে না, বউ যা-ই করুকনা কেন, সাতকাহন করে তা সারা দুনিয়াকে বলে বেড়িয়ে নিজেদেরই হাসির পাত্র করে তোলে।

গাঁ কত সাফ চেনায় ধোপার ঘাট,
শাউড়ির মুখে হাঁড়ির খবর হাট। (ওড়িয়ার[৫৬৩] অংশ)

এভাবে ঘরের কথা বাইরে নিয়ে যাওয়ার বেশ বিপদ আছে। যেমন হয়তো দেখা গেল—

ছুঁচ হারিয়ে তার খোঁজে সে
যায় গণকের কাছে—
গণক জানায় সতীত্ব সে
খুইয়েছে কার কাছে। (তেলুগু[৫৬৪])

সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ, তবে শাশুড়িদের সবচেয়ে বেশি বলীয়ান করেছে যে-মোক্ষম অস্ত্রটি, তা হল বউদের বাপের বাড়ি যাওয়া আটকে দেওয়া। যেহেতু "শাশুড়িরাও একদিন বউ ছিল (হিন্দি[৫৬৫], তামিল[১৮], তেলুগু[১৯])", ওরা জানে যে বউদের প্রাণ-ভোমরা রয়েছে ওইখানেই। বাপ হতদরিদ্র হলেও—

বাপের বাড়ির ফ্যান
আনবে ধড়ে প্রাণ। (মারাঠি[৫৬৬])

বাপের বাড়ি যাওয়া মানে
ফুলের ওপর হাঁটা,
শ্বশুরবাড়ি ফেরা মানে
পায়ের নীচে কাঁটা। (হিন্দি[৫৬৭])

এইজন্য শাশুড়িরা বউদের বাপের বাড়ি যাওয়ার সিগনালের সুইচটা নিজেদের হাতে রেখে ইচ্ছেমতো টেপাটেপি করে। ফলে প্রায়ই দেখা যায়--

কেউ কেউ গেছে বাপের বাড়িতে
কাউকে ডেকেছে সই,
বউটা রয়েছে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে
যাবার জায়গা কই! (গুজরাতি[৫৬৮])

বাপের বাড়ি কাছাকাছি হলে অতটা সমস্যা হয় না। অবশ্য একটা অসুবিধে থাকে।

সবাই বলে 'ভাগ্যবতী'
বাপের বাড়ি কাছে,
কিন্তু গেলে সিঁটিয়ে থাকি
ডাক এসে যায় পাছে। (হিন্দি[৫৬৯], অংশত তামিল[৫৭০])

সেইজন্যই একটি বউ বলেছিল—

হয়তো এমন স্বর্গ কোথাও আছে—
শ্বশুরবাড়ি অনেক দূরে,
বাপের বাড়ি কাছে। (গুজরাতি[৫৭১])

এবং বাপের বাড়ি দূরে হলে একমাত্র বরই ভরসা।

বাপের বাড়িতে তারাই যায়
বরেরা যাদের হয় সহায়। (ওড়িয়া[৫৭২])

তবে বিপদ অন্য দিক থেকেও আসতে পারে।

বাপ-শ্বশুরে করল আড়ি,
বন্ধ হল বাপের বাড়ি। (হিন্দি[৫৭৩])

অবশ্য তেমন কিছু না হলেও সব মেয়ের কাছ থেকেই একদিন বাপের বাড়ি হারিয়ে যায়।

বাপ মরেছে মা মরেছে
করছে এখন রাজ—
পরের মেয়ে ভাজ। (হিন্দি[৫৭৪])

যা-ই হোক, কথা হচ্ছিল শাশুড়িদের অত্যাচার নিয়ে। কিন্তু শাশুড়ি মানেই কি অত্যাচারী? দূর, তা আবার হয় নাকি? কত ভালো ভালো শাশুড়ি আছে, তবে তাদের কথা বলা হয় না যেহেতু প্রবাদের কাজই হল ছিদ্রান্বেষণ।

তা ছাড়া অত্যাচার করব বললেই কি শাশুড়িরা তা করতে পারে? বউরাই বা চুপ থাকবে কেন?

আসলে এতক্ষণ যে-সব বউয়ের কথা হল, বোঝাই যায় যে তারা নতুন বউ, হঠাৎ এক দঙ্গল নতুন মানুষের মধ্যে এসে একা পড়ে গেছে। বোঝাই যায় যে ওরা নেহাতই ছেলেমানুষ এবং শাশুড়িরাও বেশ শক্তসমর্থ যুবতী।

হিং বা জিরের সামনে যেমন
মিইয়ে পড়ে ধনে,
যুবতী শাশুড়ি দেখে কচি বউ
লুকোয় ঘরের কোণে। (মারাঠি[৫৭৫])

তা, শাশুড়িরা এরকম জুজুর মতো হতে চায়ই বা কেন?

ছেলেবেলায় মা-মা কত!
বউকে পেয়ে বামাপদ। (মারাঠি[৫৭৬])

ছেলের মধ্যে এত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটাই তো কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

আমরা বলতে পারি, বেচারা সবে একটা আস্ত বউ হাতে পেয়েছে, শুরুতে একটু আধটু বাড়াবাড়ি তো করবেই। কিন্তু প্রবাদের শাশুড়িরা সেটা বুঝতে চায় না। এতে ওদের চোখ টাটায় আর রাগটা গিয়ে পড়ে বউদের ওপর। সারাদিনই শাশুড়ির দখল থাকে বউয়ের ওপর। রাত্তিরে খেয়ে বরের সঙ্গে শুতে যাওয়া অবধি। ততক্ষণ শাশুড়ি শক্ত হাতে রাশ টেনে রাখে। ওই সময়টায় যাতে ও-দুজনের মধ্যে মোলাকাত না হয় তার জন্য নানান ছুঁতোয় বউকে আটকে রাখে। এমনকী বাঙালি শাশুড়িদের চিরাচরিত পন্থাতেও।

চালে ডালে সব এক হয়ে গেছে
শুরু করো তুমি বাছা,
তোমার বরকে জলখাবারটা
আমিই দিচ্ছি বাছা। (হিন্দি[৫৭৭])

ওদিকে কাজ থেকে ফিরে বউয়ের দেখা না পেয়ে বর ছটফট করে। বউকে অতসব ফালতু কাজ করতে দেখে বিরক্ত হয়, কেননা এ বিষয়ে ওর কোনও সন্দেহই নেই যে—

পিলসুজেতেই মানায় যেমন সলতে—
বউকে শুধু খাটেই মানায়
সে কথা আর বলতে! (মারাঠি[৫৭৮])

ছেলে মায়ের ওপর চটতে শুরু করে। তখন ওর কাছে যে "বউ হল গুড়", তাই মা হয়ে ওঠে "মাটির ড্যালা, ডাইনি, বিষ.....আরও কত কী (তেলুগু[৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১], তুলনীয় বাংলা [৫৮২])!" হাবে-ভাবে সেটা প্রকাশও পেয়ে যায় এবং মা বোঝে ছেলে বেহাত হয়ে গেল। স্বচক্ষে মা দেখে তার ছেলে—

মায়ের সামনে ত্যাড়া
মাগের সামনে ভ্যাড়া। (মারাঠি[৫৮৩])

মা বিয়োল আর মাগ পেল[৫৮৪]—এত বড়ো বঞ্চনা, এত বড়ো হার সহ্য করতে না পেরে প্রবাদের জগতের অনেক শাশুড়ি এমনকী ছেলের মৃত্যুর বিনিময়েও বউয়ের বৈধব্য যন্ত্রণা দেখতে চায় (কন্নড়[৫৮৫], তামিল[৫৮৬], মলয়ালম[৫৮৭, ৫৮৮])।

কোনও কোনও শাশুড়িকে আবার এও বলতে শোনা যায়—

ছেলেটা আমার সুখে থাকুক
খেয়ে দুধ-পিঠে-মেওয়া;
বউ মাগি হোক বেওয়া। (তেলুগু[৩৮৯])

মায়েরা সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করে যখন রাত্রে ছেলে-বউ একসঙ্গে শুতে যায়। ধরেই নেয় যে বউ এবার বরকে বাগে পেয়ে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে ছেলের কান ভাঙাবে[৩৯০]।

এটাকে প্রবাদের শাশুড়িরা ব্ল্যাক-মেলিং বলে ধরে নেওয়ায় তাদের কাছে ছেলে-বউয়ের গোটা সম্পর্কটাই অশ্লীল বলে মনে হয়। কথায় বলে—

কুকুরির যেটা কার্তিকে
বিড়ালির যেটা মাঘে—
সেই কামবায়ু নারীর শরীরে
বারোটা মাসই চাগে। (রাজস্থানীর[৩৯১] অংশ, অংশত হিন্দি[৩৯২] ও রাজস্থানী[৩৯৩])

প্রবাদের শাশুড়িদের মনে এরকম কোনও চিন্তা খেলে কি না জানা নেই, তবে এ-সব ব্যাপারে প্রায়ই ওরা বউদেরই যত নষ্টের গোড়া বলে মনে করে। তাই রাত্তিরে ওদের খাওয়ার পাট চুকতেই হয়তো গজগজ শোনা যায়—

ছুঁচের পেছনে সুতো
চলল ছায়ার মতো। (মারাঠি[৩৯৪])

অবশ্য ছেলেও একেবারে বাদ যায় না।

সূর্য নামল পাটে
চলল দুজন খাটে। (হিন্দি[৩৯৫])

বরকে দেখে বউ ঘোমটা দিলেও কোনও কোনও শাশুড়ি ফুট কাটে—

দিনের বেলায় শরম
রাত্রে বগল গরম। (হিন্দি[৩৯৬])

বউয়ের ওপর শাসন আরও কড়া হয়। কেননা—

শাশুড়িরা যা-যা শেখাতে চায়
সেটাই আসল শিক্ষা,
বরেদের কাছে বউ শুধু পায়
অসভ্যতায় দীক্ষা। (কন্নড়[৩৯৭])

ছেলের প্রতি মায়ের রাগের চেহারাটাই আলাদা, যেহেতু মা-মা করা থেকে শুরু করে বউ-বউ করা অবধি ছেলের গোটা বিবর্তনটা মায়ের জানা।

বিয়ের আগে ময়ূর,
বিয়ে পাকলে বাঘ,
বিয়ের পরে ছাগ। (তেলুগু[৩৯৮])

ছাগল হোক ভেড়া হোক অবাক হয়ে মা ভাবে—

বোয়ের মূল্য কানাকড়ি,
তার পায়ে কিনা ভেড়াবলি! (কাশ্মীরি[৫৯৯])

ভবিষ্যৎটাও দেখতে পায় মা।

বিয়ের আগে নিজেই সব
বিয়ের পরে মাগ,
বাচ্চা হলে বাপকে তারাই
করে নেবে ভাগ। (কন্নড়[৬০০])

'বউয়া' অর্থাৎ স্ত্রৈণরা "পাইকের ফাটা পা, অলস বলদ বা অশ্বকণ্ঠী গায়কদের মতোই অসহ্য (ওড়িয়া[৬০১])।" সেইজন্যই হয়তো মা সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে বউয়ের দোষেই ছেলে এমন হয়েছে।

বোয়ের কাছে শিখে 'অ-আ'
হয়েছে ছেলে বউয়া,
বউ বানালে গোদা রুটি
ভাবে সে মালপোউয়া। (হিন্দি[৬০২])

তবে ছেলেদের একেবারে যে ছেড়ে দেয় তা নয়।

পুত্র আমার লায়েক হয়েছে
তা দিচ্ছে সে মোচে—
আর আমাদের পোছে! (গুজরাতি[৬০৩])

তার মানে কি শাশুড়ি মানেই হিংসুটে?

তা-ই যদি হত মায়েরা কি ছেলের বিয়ের জন্য এত হেদিয়ে মরত? কত সময়ই তো দেখা যায় বউ পেয়ে গোড়ায় শাশুড়ি মহাখুশি, কিন্তু পরে কী যে হয় ওদের!

শাশুড়ি বউকে দেখে যায় গলে,
পরে বউয়ের নামে ওঠে জ্বলে। (গুজরাতি[৬০৪])

এমনকী এও হয় যে—

লক্ষ্মীমন্ত দেখেই বেছেছে পাত্রী
তবু ওর সাথে খটামটি দিবারাত্রি। (হিন্দি[৬০৫])

শুধু তা-ই বা কেন, জন্ম থেকে দেখছে সইয়ের মেয়ে কত সোনা মেয়ে, তার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে।

বউ হয়ে ঘরে এল
ভালোবাসা মরে গেল। (হিন্দি[৬০৬])

তবে লক্ষ্মী মেয়েটির স্বভাব পরে পালটে গিয়েও থাকতে পারে, যেমন শহরে যাওয়ার ফলে একটি মেয়ের হয়েছিল।

এ গাঁয়ে থাকতে ছিল ভালো মেয়ে,
পালটে গেছে সে টিপকলে নেয়ে। (হিন্দি[৬০৭])

আসলে এগুলো কোনও ব্যাপারই নয়, যত দোষ ওই শাশুড়ি-বউ সম্পর্কটার। এ-সম্পর্ক এমন দুটি মানুষের মধ্যে কাজিয়া বাধিয়ে দিতে পারে, আলাদা করে দেখলে যারা দুজনেই বেশ ভালো।

যখন শাশুড়ি বাড়িতে থাকে না
বউটা লক্ষ্মী কত!
বউ না থাকলে শাশুড়িটা যেন
জগদ্ধাত্রীর মতো। (তেলুগু[৬০৮])

বলতে হয়, গোটা ব্যাপারটাই শর্তসাপেক্ষ।

চাইছ 'সোনার বউ' হবে?
মাটির শাশুড়ি হও তবে। (তামিল[৬০৯], অংশত মারাঠি[৬১০])

সে যা-ই হোক, মোট কথা হল শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে খিটকেল থাকবেই। খোদ দেবভাষাতেও তা বলা হয়েছে।

প্রায়ঃ শ্বশ্রূস্নুষয়োর্ণ দৃশ্যতে সৌহৃদং লোকে।

আর আঞ্চলিক ভাষাগুলোতে এরকম আপ্তবাক্য তো মুড়ি-মুড়কির মতো পাওয়া যায়।

বউ-শাশুড়ির বনিবনা?
বিরল, যেমন খাঁটি সোনা। (তামিল[৬১১])

নিম সে যেমন হয় না মিষ্টি,
ভালো-শাশুড়ির হয়নি সৃষ্টি। (তেলুগু[৬১২])

শাশুড়ি হয় না চিনি,
হয় না মা ডাকিনি। (গুজরাতি[৬১৩])

শাশুড়ি হয় না মা,
বউ মেয়ে হয় না। (কাশ্মীরি[৬১৪], অংশত মলয়ালম[৬১৫])

তবে আরও একটা কথা শোনা যায় যা বেশ ভাবিয়ে তোলে।

শাশুড়ি হয় না মা,
বউ কারও হয় না। (গুজরাতি[৬১৬])

তার মানে কি বরেরও কেউ হয় না বউ?

কে জানে? তবে এতক্ষণ ধরে একতরফা ভাবে শাশুড়িদের নিন্দেমন্দ করা হল বলে বউরা যে ধোয়া তুলসী পাতা তা মোটেই নয়। যেসব ছেলেমানুষ বউ একসময় অত্যাচারিত হয়েছিল (বা হয়নি) তারা একসময় স্বমূর্তি ধারণ করতে শুরু করে। শুরুটা হয় ওস্তাদ- শাকরেদের যুগলবন্দির আলাপ দিয়ে, যখন শাকরেদ শুধু ওস্তাদকে ঠেকা দিয়ে যায়। তারপর গত্ শুরু হতেই সেও কষে হাত লাগায়। শেষকালে ওরা ঝালায় চলে যেতেও পারে।

তবে এমনও শোনা যায় যে, কোনও কোনও বউ শুরুতেই ঝালায় চলে যায় একতরফা ভাবে।

কী গো শাশুড়ি-মা, তড়পাও কেন
কোমরে জড়িয়ে শাড়ি?
ডুলি থেকে আমি নেমেই দেখোনা
আলাদা করব হাঁড়ি। (হিন্দি[৬১৭])

এমনকী আস্ফালনটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংবাদও মেলে।

অ্যাই শাশুড়িটা, এইখানে কেন
বিছানা তোমার পড়ে?
এ ঘর আমার, আমিই থাকব,
তুমি যাও ঢেঁকিঘরে। (হিন্দি[৬১৮])

এ তো তুচ্ছ, এমন খবরও পাওয়া যায় যে—

উঠোন দাপিয়ে বউ এল,
শাশুড়ির নাড়ি ছেড়ে গেল। (গুজরাতি[৬১৯])

শ্বশুর, শাশুড়ি—দুটোকে খেয়েছে
ঘরজামাইটা যায়নি বাদ,
বারোটা গাঁয়ের গাধাও খেয়েছে
তবু বউটার মেটেনি সাধ। (গুজরাতি[৬২০])

বাপ-শ্বশুরের বংশ খেয়েছে,
শুকিয়ে দিয়েছে অশথ গাছ,
আসছে ছুটে মুষল হাতে
নাচবে এবার প্রলয় নাচ। (বিহারি[৬২১])

কী, এগুলোকে কি অপপ্রচার বলে মনে হচ্ছে?
তা, এক মামি-শাশুড়ি সেরকমই ভেবেছিল বটে।

আপন শাশুড়ি খেল তো লাথি,
খুড়শাশুড়ি খোয়াল কান—
মামি-শাশুড়িটা এখনও ভাবছে
বউ তাকে দেবে প্রাপ্য মান। (মারাঠি[৬২২])

এটাও হয়তো অপপ্রচারই, কিন্তু "যা রটে তার কিছু তো বটে।" শাশুড়িকে কিল মেরে বউয়ের পরচালায় উঠে পড়ার খবর তো আমরা আগেই পেয়েছি[৩০২], এখানে শাশুড়িকে মারার একটা সম্ভাব্য কারণও পাওয়া যায়। আমরা জানি বাংলার এক বউ শাশুড়ির গুঁতো খেয়ে ছুঁতো পেয়ে গিয়েছিল[৬২৩], কিন্তু এখানে ছুঁতো বলতে কী?

শাশুড়ির ধান ভানার শব্দে
ভাঙে বউয়ের ঘুম,
শাশুড়ি বউকে তুলে দিতে গিয়ে
পিঠে খেল গুমগুম। (বিহারি[৬২৪])

হ্যাঁ, এ হল সেই সব বউয়ের কথা যারা সংসারের চাবিকাঠি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। তাই, যা হবার তা-ই হয়।

শাশুড়িই আটা পেষে এখন
তাল ঠোকে বউ তা-ধিন,
বেটি যে হয়েছে স্বাধীন! (মারাঠি[৬২৫])

বার বার জল তুলে কুয়ো থেকে
শাশুড়ির হাঁফ ধরে,
ক্ষীর দিয়ে রুটি খেতে খেতে বউ
দেখে বসে তার ঘরে। (গুজরাতি[৬২৬])

দুধও দুইতে ওঠেনি শাশুড়ি
খেয়েছিল কাল চাট,
বউ ফুট কাটে—দেখোগে সুয্যি
শুয়ে আছে বড়ো লাট। (হিন্দি[৬২৭])

হয়তো এগুলো নেহাতই প্রতিশোধ। অতীতে ঘটেও থাকতে পারে এরকম কিছু একটা—

খুন্তি পুড়িয়ে শাশুড়ি বোয়ের
পোঁদে দিতে গেল ছ্যাঁকা,
পায়ে পড়ে কত কাঁদল বউটা
বউকে বলল 'ন্যাকা'। (হিন্দি[৬২৮])

কথাটা যদি সত্যি হয়, বউয়ের হক আছে শাশুড়িকে ইহলোকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে না দেওয়ার। এমনকী পরলোকেও।

তবে এভাবে নিশ্চয়ই নয়—

শাশুড়ির নামে নাম রেখে
ঠেলে সে মেয়েকে চুলো-মুখে। (তেলুগু[৬২৯])

তবে কিছু বন্য প্রকৃতির মেয়ে থাকে যারা নিরীহ, এমনকী স্নেহময়ী শাশুড়িদেরও ছেড়ে কথা কয় না। ফলে শাশুড়ির হালটা দাঁড়ায়—

আগে কত 'বউ-বউ'
আজ শুধু 'কেঁউ-কেঁউ।' (মারাঠি[৬৩০])

এদের আনুগত্য বলে যদি কিছু থাকে তা বাপের বাড়ির প্রতি।

শ্বশুরবাড়ির গরুটা যে ম'ল
সেটা যেন কিছু নয়,
বাপের বাড়িব কুকুরের শোকে
উথাল পাথাল হয়। (পাঞ্জাবি[৬৩১])

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা করায় ক্লান্তি নেই।

ঢুকেছিল হয়ে কেন্নো—
বিছে বনে তার গরলে করল
সব ভায়েদের ভেন্ন। (হিন্দি[৬৩২], অংশত পাঞ্জাবি[৬৩৩])

বরেদের মেরুদণ্ড একটু পলকা হলেই এরা তাদের কবজা করে ফেলে। শাশুড়িদের আক্ষেপ শোনা যায়—

বউটা ছেলেকে করেছে তুক,
তাইতো দেখি না সুখের মুখ। (হিন্দি[৬৩৪])

বোয়ের গলায় হাঁসুলি,
ত্যানা পরে থাকে শাশুড়ি। (হিন্দি[৬৩৫], তামিল[৬৩৬], তুলনীয় বাংলা[৬৩৭])

এমনকী প্রবাদের জগতের বউদের তুকের জোর এতখানি হয় যে নিজের মাকেই বাড়িছাড়া করে ছেলে।

ছেলের গজাল দাড়ি
মা-টি হারাল বাড়ি। (গুজরাতি[৬৩৮], তুলনীয় বাংলা[৬৩৯])

ছেলেমেয়েদের পরের হাতে সঁপে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে দেখেছি আমরা এক বাঙালি[৬৪০] মাকে। অন্যত্রও একই রকম ছবি পাওয়া যায়।

ছেলেদের নিল সিঁধেল মেয়েরা,
মেয়েকে সিঁধেল ছেলে,
সিঁধের সামনে বুড়োবুড়ি বসে
শূন্য চক্ষু মেলে। (পাঞ্জাবি[৬৪১], অংশত অসমিয়া[৬৪২])

তবে শ্বশুর-শাশুড়ি যদি তেমন বুড়ো না হয় এবং কিছুটা অন্তত ট্যাকের জোর থাকে, পরিণতিটা অন্যরকম হতে পারে।

শাশুড়ি-বোয়ের কাজিয়াতে
ভেন্ন হল তো চুলো,
ভাগাভাগি হল ঘটি-বাটি
আধাআধি হল কুলো। (বিহারি[৬৪৩])

তবে সহাবস্থানের কথাই বেশি শোনা যায় প্রবাদের জগতে। যদিও অনেকের মতেই "দূরে থাকো সুখে থাকো (সিন্ধি[৬৪৪])" নীতিই ভালো, কিন্তু সহাবস্থানের কিছু সুবিধে আছে। খ্যাচাখেঁচি সমানে চলতে থাকলেও খুচখাচই চলে, খুব একটা তুমুল হয়ে উঠতে পারে না, সাংসারিক দায়দায়িত্বই ঝগড়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—

শাশুড়ি-বউরা ততক্ষণই
কোচল-কোঁদল করে—
যতক্ষণ না উনুনে হাঁড়ির
খিচুড়ি উথলে পড়ে। (গুজরাতি[৬৪৫])

খিচুড়িটাকে এর পরেও উনুনেই থাকতে দিলে যে সংসার অচল হয়ে পড়ে। ভাবুননা এরকম এক পরিস্থিতির কথা—

শাশুড়িও রানি বউটাও রানি—
কে এখন তোলে কুয়ো থেকে পানি! (হিন্দি[৬৪৬], অংশত রাজস্থানী[৬৪৭] ও উর্দু[৬৪৮])

এ ছাড়াও কোচল-কোঁদলের আরেকটা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আছে, যার মূলে রয়েছে প্রতি-আক্রমণের ভয়। এটা আক্রমণকারীকে অনেকখানি সংযত রাখে। গোড়ার দিকে হয়তো এক পক্ষ দক্ষতার অভাবে পালটা আক্রমণ ঠিকমতো করতে পাবে না, কিন্তু প্যাঁচ-পয়জারগুলো শিখে নেওয়ার উপায় তো হাতের কাছেই থাকে।

না হয় মুখে সে দিল কালি,
শিখে তো নিচ্ছি যত গালি। (হিন্দি[৬৪৯])

ফলে দুজনের মধ্যে তফাতটা কমতে কমতে একসময় উনিশ-বিশে দাঁড়ায়। এমনকী শাশুড়িকে ছাপিয়েও যায় বউ। যেমন একটা জুটির খবর পাওয়া যায় যেখানে "শাশুড়ি জানে বারোটা তাল আর বউ জানে তেরোটা (পাঞ্জাবি[৬৫০])।"

আবার কোথাও কোথাও—"শাশুড়ি পিদিম গিলে খায় তো বউ মশাল (কন্নড়[৬৫১])।"

তা বউ যেমনই হোক বউ ছাড়া গতি নেই, বউ না থাকলে সৃষ্টিই যে থেমে যাবে, কিন্তু সংসারে 'শাশুড়ি' পদটা থাকা কি আদৌ বাঞ্ছনীয়?

হ্যাঁ, কাশ্মীর ও কন্যাকুমারীর প্রবাদের জগৎ থেকে এ উত্তর পাওয়া গেছে।

কুড়ুল থাকলে থাকে গাঁ
শাউড়ি থাকলে ঘর;
না থাকলে থাকে বন
সেখানেই বউ-বর। (কাশ্মীরির[৬৫২] অংশ, অংশত তামিল[৬৫৩])

ছয়

আর বউমাদের সঙ্গে শ্বশুর ঠাকুরদের সম্পর্ক কীরকম হয়?

এই দেখুন ওরা লজ্জা পাচ্ছে।

আরে না না, ওরকম দু-চারজনের ব্যভিচারের[৪৩৩, ৪৩৪ ৪৩৫] জন্য গোটা শ্বশুর-সমাজ কেন দায়ী হতে যাবে? তা ছাড়া ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয়। শ্বশুর মানেই তো আর বুড়ো-হাবড়া নয়, হয়তো দেখা যাবে ছেলের চেয়ে মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের বড়ো। এমন কত তো শোনা যায়—ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিল।

যতবার বাবা ছেলের জন্য
দেখতে যাচ্ছে পাত্রী,
ততবার ঘটে যাচ্ছে ছেলের
সদ্য মাতৃপ্রাপ্তি। (অসমিয়া[৬৫৪])

সুতরাং বয়স কোনও বাধা নয়। তার ওপর যদি সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে গিন্নি আগেভাগে সরে পড়ে থাকে, পুত্রবধূ-গমনের যুক্তিও মেলে বইকী। যেমন—

ধরে রাখতে পারে না জল
কলসি হলে কানা,
গিন্নি ম'লে শ্বশুর ভোলে
ইঙ্গিতে রাশ টানা। (গুজরাতি[৬৫৫])

তবে বাস্তবে এসব কতটা ঘটে তা নিয়ে সন্দেহ আছে, কেননা বিপত্নীকদের নিয়ে গালগল্প করা নিন্দুকদের একটা স্বভাব। যেমন বলা হয়—

হলে মৃতদার
খোলে ন'টি দ্বার। (অসমিয়া[৬৫৬])

তবে শোনা যায়, ব্যাকরণ বহির্ভূত সম্পর্কের আশঙ্কা থেকে যায় বলেই নাকি শাশুড়িরা বউদের ঘোমটা নিয়ে অত কড়াকড়ি করে। এমনকী আবরু জোটাবার যথেষ্ট সাধ্য না থাকলেও।

বউকে শাশুড়ি যেই দেয় মুখ-ঝামটা—
বুকের কাপড় উঠে হয় তার ঘোমটা। (হিন্দি[৬৫৭])

তবে একটা ক্ষেত্রে খুব কড়াপাকের শাশুড়িও বোধ হয় তেমন কড়াকড়ি করে না।

শ্বশুর হলে দৃষ্টিহারা
বউরা ঘোরে ঘোমটা ছাড়া। (গুজরাতি[৬৫৮])

আবার এক একটা পরিস্থিতি এমন হয় যে বউদের পক্ষে পরদা বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

শ্বশুর যে-খাটে শুয়ে আছে
তারই পাশে জাঁতাকল,
বউটা পিষতে এসে আটা
দেখে বড়ো গ্যাঁড়াকল। (হিন্দি[৬৫৯])

বেজায়গায় হল ঘা—
বদ্যি শ্বশুর? ম'ল যা! (রাজস্থানী[৬৬০], তুলনীয় তেলুগু[৬৬১])

তবে পরদা রাখার ব্যাপারে বউরা কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত হবে তা অনেকটা নির্ভর করে শ্বশুরদের ব্যক্তিত্বের ওপর।

এত রাশভারী শ্বশুর নামের যমটা—
পারে কি বউটা না দিয়ে মাথায় ঘোমটা! (হিন্দি[৬৬২], অংশত গুজরাতি[৬৬৩])

আর শ্বশুর যদি যম সেজে না থাকে? শোনা যায়—

বলবে "একটা গল্প শুনুন"
বউ যদি হয় ছ্যাবলা,
গুছিয়ে বসে শুনবে শ্বশুর
সেও যদি হয় ক্যাবলা। (গুজরাতি[৬৬৪])

কিন্তু সত্যিই কি ওরা ছ্যাবলা-ক্যাবলা? আমরা তো এতে এক আধুনিক সমাজের ছবি পাই। তবে স্মার্ট বউদের কদর প্রবাদের জগতেও আছে।

বউমা হলে তেমন চালাক চতুর
ধারেও বলদ কিনে দেবে শ্বশুর। (হিন্দি[৬৬৫])

তবে ভালো শ্বশুরের সবচেয়ে বড়ো খবরটা দিয়েছে আরেক বউ।

সংসারটা করি আমি
যেন একটা ডাকুর,
ভাগ্যি ভালো মাথার ওপর
আছেন শ্বশুর ঠাকুর। (হিন্দি[৬৬৬])

তবে সব বউ কি আর শ্বশুরকে মাথায় করে রাখে? বাংলায়[৬৬৭] আমরা এক বউকে দেখেছি মাঠ সেরে এসে শৌচ না করেই শ্বশুরকে ভাত বেড়ে দিতে। অন্যত্র শোনা যায়—

পাখা ধরে বউ হাত নেড়ে যায়—
যাতে না শ্বশুর আরও রুটি চায়। (হিন্দি[৬৬৮])

আর বুড়ো শ্বশুরের দায় অনেক বউয়ের কাছে যে কত বড়ো বালাই! ঘরে ঘরে শোনা যায়—

প্রতিবারই বাঁচে খুব বাঁচান,
খালি সে করে না ওই মাচান। (গুজরাতি[৬৬৯])

আবার এরই মধ্যে কোনও কোনও বউয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—

যমদূতেরা নিকনা আমার
শাশুড়িকেই বেছে,
শ্বশুরঠাকুর থাকেন যেন
চিরটা কাল বেঁচে। (হিন্দি[৬৭০], অংশত বিহারি[৬৭১])

শ্বশুরের কথায় যেমন আবার শাশুড়ির কথা এসে গেল, তেমনিই শাশুড়ির কথায় ননদের কথা এসে যায়। কেননা বউদের চোখে ননদেরা শাশুড়িদের চেয়ে কিছু কম নয়। ওদের মতে—

শাশুড়িরা হলে 'কাল'
ননদেরা তরোয়াল। (তেলুগু[৬৭২])

তাই এক বউকে বলতে শোনা যায়—

ভেন্ন হতে দূর তো হল
শাউড়িটার বালাই,
ভাগে পড়ল একটা ননদ
প্রাণ বলছে পালাই। (বিহারি[৬৭৩])

এদিকে আমরা তো জানি সতিনের চেয়ে বড়ো শত্রু হয় না, "সতিনের ছবি পর্যন্ত ঘেন্নার জিনিস (হিন্দি[৬৭৪])।" কিন্তু কোনও এক ভূয়োদর্শী বলেছেন—"যেমন এক-ঝুড়ি কাঁচা নাসপাতির চেয়ে একটা হলেও পাকা ভালো, জ্ঞাতিদের টিটকিরির চেয়ে বাইরের লোকের গালাগালি ভালো, তেমনি একই গাঁয়ে ননদ থাকার চেয়ে বাড়িতে সতিন থাকাও ভালো (কাশ্মীরি[৬৭৫])।"

কিন্তু ননদদের অপরাধটা কী?

ননদ কেবলই করে যে মুখ,
চুকলি কেটেই পায় সে সুখ। (মারাঠি[৬৭৬])

প্রবাদের জগতে আদতে সব ননদই এক, তবে অবস্থান অনুযায়ী তাদের রণকৌশলের রকমফের ঘটে। যেমন 'বড়ো' অর্থাৎ বিবাহিত ননদেরা হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়ে রীতিমতো বজ্রপাত ঘটিয়ে যায়, আর 'ছোটো' অর্থাৎ আইবুড়ো ননদেরা কম হলেও একটানা চাপ রেখে যায়। যেমন এক 'ছোটো' ননদ তো সমানে বউদিকে আবরু রক্ষা করতে আর সহবত মেনে চলতে শেখাত।

ছোটো ননদটা বুকের কাঁচুলি,
বড়োজন বিনা মেঘের বিজুলি। (বিহারি[৬৭৭])

বাংলা প্রবাদে যেমন 'খুদে' ননদদের একটা বিশেষ স্থান আছে, অন্যত্রও তা দেখা যায়।

যে-ননদটা খুদে
সেই সবচেয়ে দুঁদে। (হিন্দি[৬৭৮])

খুদে ননদটা বিষের মোড়ক
সে-ই তো আমায় দেখায় নরক। (হিন্দি[৬৭৯])

আইবুড়ো ননদেরা ভাজেদের সঙ্গে এমনিতে তো টুকটাক চালিয়ে যায়ই, তার ওপর ঘরে শাশুড়ি না থাকলে ওরা নাকি আরও তিলিয়ে ওঠে।

শাশুড়ি নেই তো কী?
তার বাড়া তার ঝি। (মারাঠি[৬৮০])

ননদেরা কেবলই নাকি ভাজেদের বরেদের কাছ থেকে টাকা খিঁচে নেয়।

স্বভাবেই গাঁটকাটা—
দাদাকে পেয়েছে পাঁঠা। (কাশ্মীরি[৬৮১])

সব ব্যাপারে হিংসে।

পাতে বসে দাদা
যখন যা-যা না খাবে—
বউদির ভোগে যাবে। (তামিল[৬৮২])

কেবলই অবিশ্বাস।

দাদা যা দেয় তা প্যাঁটরায় রাখে,
বউদি দিলে তা আলনায়—
পরে যদি মত পালটায়! (গুজরাতি[৬৮৩])

ওদিকে বিবাহিত ননদেরা এক একবার এসে যে খিটকেল বাধিয়ে যায় তার জের চলতেই থাকে।

দূর গাঁ থেকেও ননদ পাঠায় খালি—
ভাজের জন্য চোখা চোখা যত গালি। (কাশ্মীরি[৬৮৪])

ননদিনি থাকে বারো ক্রোশ দূরে—
তবু সে-গন্ধে দুধ যায় ছিঁড়ে। (মারাঠি[৬৮৫])

যতবার ননদেরা আসে, ওদের নিয়ে নিজের কর্তাটির অদিখ্যেতা দেখে গা জ্বলে যায় ভাজেদের।

বড়ো তো এসেছে ননদ—
ছুঁড়ির দাদার ঢং দেখে ভাবি
এল বাদশার সনদ। (উর্দু[৬৮৬])

তার ওপর ননদের যদি সচ্ছল ঘরে বিয়ে হয়ে থাকে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার অক্ষম প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়।

হার পরে এল স্বামীর বোনটি,
সেও পরে নিল গলায় কণ্ঠি। (কোঙ্কনি[৬৮৭], মারাঠি[৬৮৮])

দুপ-ক্ষই গরিব হলে আবার অন্য কোনও ঝামেলা হতে পারে। যেমন—

আমাকে তুমি যে
ঝি বলে দিলে ঠাকুরঝি,
তুমি তো নিজেই
জায়ের বাড়িতে বাবুর্চি। (হিন্দি[৬৮৯])

ওদিকে যদি নন্দাইটার একটু ইদিক-সিদিক বাই থাকে ভাজ একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়ে যায়। অন্তত ফুট কাটার সুযোগ পায়—

কী গুণধর জামাই!
এসছে দেখেই কাজের মেয়েটা
করতে লাগল কামাই। (হিন্দি[৬২০])

এমনকী "ননদের ননদও যদি বর থাকতেও রসের নাগর জুটিয়ে থাকে তাতেও ভাজ মহাখুশি হয় (গুজরাতি[৬২১])।"

ননদ ভাজ দুজনেই ছেলেমানুষ হলে কাজিয়াটা অন্যরকম চেহারা নেয়। যেমন—

বরের মারে তো কাঁদিনি—
হাসল যে রায়বাঘিনি! (তেলুগু[৬২২])

এসব ক্ষেত্রে ভাজেরা ননদদের শুনিয়ে দিতে পারে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে" তত্ত্বের কথা।

তুমি ননদিনি খুব তো আমায়
এখন জ্বালিয়ে মারছ,
তুমিও এবার কদিন পরেই
শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছ। (মারাঠি[৬২৩])

একটি পরিবারের নানান সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সংলাপ শোনা যেতে পাবে।

—"আমাকে নিতে যে বড়দা এসেছে,
অ দিদি এসোনা ইদিকে!"
—"যাও গিয়ে বলো দিদিকে।" (মারাঠি[৬২৪])

আসল ঘটনাটা হল, বাড়ির ছোটো বউ বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইছে বড়ো জায়ের কাছে, আর বড়ো জা তাকে ঠেলে দিচ্ছে বড়ো ননদের দিকে যার অনুমতিটাই আসল, অর্থাৎ যে হল আসল বস।

হ্যাঁ, অনেক সময়ই কোনও কোনও পরিবারে দেখা যায় ভাজেদের ভাগ্যে জুটেছে এমন এক বয়স্ক অবিবাহিত বা স্বামী-পরিত্যক্ত বা বিধবা ননদ যার দাপটে ভাজেরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বড়ো ননদ হতচ্ছাড়ি—
ঘোরায় মাথায় হাতের ছড়ি। (হিন্দি[৬২৫])

ননদ আধা স্বামী
দুগুণ বাঁধা আমি। (তেলুগু[৬২৬])

তবে অর্থনৈতিক যুক্তিতে সংসারে ভাজেদেরই আধিপত্য থাকার কথা। সাধারণত সেইটাই থাকে এবং তেমন তেমন ভাজ হলে ননদদের হাঁড়ির হাল করে ছাড়ে। উঠতে বসতে মুখনাড়া তো আছেই।

ভাজের বুলি
বিষের গুলি। (হিন্দি[৬২৭])

তবে এ বিষে অনেক জ্বালা থাকলেও মরণ নেই। বরং—

সয়ে নিলে ননদনাড়া
কেটে যাবে অনেক ফাঁড়া। (হিন্দি[৯৮])

অর্থাৎ ভাজকে যদি মুখেই ঝাল ঝেড়ে নিতে দেওয়া হয়, তখনকার মতো ননদ অনেক বড়ো নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচে।

অবশ্য সে আর কতটা ছাড়, যেখানে ভাজ নিজে মুখে বলে—

ননদ আমার কুয়োটার কপিকল—
যতই করুক ক্যাঁচক্যাঁচ সে
আমি ভরে নিই জল। (মারাঠি[৯৯])

এই যদি ভাজের মতি হয়, মনে মনে ননদ বলতেই পারে—

ভাইটা মরলে বড়ো শোক পাব,
দুঃখ হবেই......সে যাক;
ঘুচুক মাগির সিঁদুর পরাটা
ভাঙবে তো তার দেমাক! (রাজস্থানী[১০০])

কিংবা—

ননদ আস্ত ডাইনি—
উচিত ওটাকে ধরে
পোড়ানো রান্নাঘরে। (তেলুগু[১০১])

আবার ননদের বিয়ে যদি একই পাড়ায় হয়ে থাকে ভাজেদের কাছে সেও এক বিরাট বালাই হয়ে উঠতে পারে। আর, পাশের বাড়িতে হলে তো কথাই নেই।

পড়শি হলে ননদিনি
এসে জ্বালায় প্রতিদিনই। (হিন্দি[১০২])

এবং জ্বালানোর মাত্রাটা এতদূর হতে পারে যে, শেষে দেখা গেল—

পোড়ে ননদের ঘর
'কারও' নেই নড়চড়। (বিহারি[১০৩])

ননদ চেঁচাল 'আগুন'—
ভাজ নিয়ে এল বেগুন। (হিন্দি[১০৪], অংশত মারাঠি[১০৫])

এইসব দেখেই এক ভূয়োদর্শী বলেছেন—

গোত্র তোমার যেটাই হোকনা—
শাণ্ডিল্য কি ভরদ্বাজ,
খিটিমিটি সে তো লাগবেই হলে
সম্পর্কটা ননদ-ভাজ। (হিন্দি[১০৬])

তবে ননদ-ভাজের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা একেবারেই থাকে না বললে সত্যের অপলাপ হয়। এমন খবরও তো পাওয়া যায়—

ছোটো ননদটা বড়ো জা'র এত ন্যাওটা,
নথটি বাগিয়ে মারল কেমন দাঁওটা! (হিন্দি[১০৭])

বাগিয়ে নেওয়ার মধ্যে কটু গন্ধ পাচ্ছেন?

আরে না না, ওটা তো ছোটো জায়ের উক্তি! এর মধ্যে শুধু জায়েদেরই আকছা-আকছির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এক বাঙালি[১০৮] বউ একবার বেশ বুদ্ধি করে একটা কথা বলেছিল—ননদ তো একদিন পর হয়েই যাবে, শাশুড়িও চোখ বুজবে; সুতরাং যেহেতু জা-জাউলির সঙ্গেই চিরটা কাল কাটাতে হবে ওরাই আমার আপন। কিন্তু প্রবাদের জগতের আর সমস্ত জা এই সোজা কথাটা বুঝল না। তাই সেখানে—

সম্পর্কটা জা'র জা'র—
মুষিকের সাথে মার্জার। (মারাঠি[১০৯])

এর দরুন এদের সম্পর্কে নাহক কত কথাই যে শুনতে হয়!

জায়েদের যত ঝগড়া,
সতিনে সতিনে হিংসে—
ঘুচবে না কোনও দিন সে। (মারাঠি[১১০, ১১১])

জায়ে জায়ে যদি লড়ে—
খাবি খেয়ে শেষ করে। (সিন্ধি[১১২])

থেকে থেকে কেন জায়েরা
সোপর্দ করে যে দায়রা! (হিন্দির[১১৩] অংশ)

কিন্তু এত কাজিয়ার কারণটা কী?

কারণের কি অভাব আছে? কে কত বড়ো ঘর থেকে এসেছে, কে ঘর থেকে কত মালকড়ি এনেছে, কে মালকড়ি যতই আনুকনা কেন বাপের রেস্তর তুলনায় কম, কার বর কত রোজগার করে, কার বর বাড়িতে বেশি টাকা দেয়......আরও কত কী!

এসবের ভিত্তিতে শাশুড়িরা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিও প্রয়োগ করে। বউদের মধ্যে একজন মার্কামারা হয়ে ওঠে—

লাটসাহেবের বেটি
শাউড়ির নেটিপেটি। (হিন্দি[১১৪], তুলনীয় বাংলা[১১৫])

অন্য জায়েরা 'বড়োলোকের বিটি'র প্রতি শাশুড়ির ভক্তি-ছেদ্দা দেখে গা-টেপাটেপি করে।

কখনও শুনেছে কেউ
শাশুড়ি বোয়ের ফেউ? (হিন্দি[১১৬])

ওসব বউ কাজে ফাঁকি দিয়েও দিব্যি পার পেয়ে যায়। ভাবটা এইরকম—

কাজে তো বড়ো-জা দড়,
কথায় আমিই বড়ো। (পাঞ্জাবি[১১৭])

ওদের কেউ কেউ শাশুড়ির একটু আধটু বকুনিতেই ঠোঁট ফোলায়। কিন্তু একটু 'আহা-উহু'র আশায় ওরা অন্য কোনও জায়ের কাছে গেলেই হয়েছে। শুনতে হবে—

তোমায় কাটে ছারের মতো
আমায় যেন বিছে,
আজকে কেন আমার কাছে
কাঁদুনি গাও মিছে? (হিন্দি[১১৮])

কোনও এক জায়ের বরের রোজগার বেশি হওয়ায় আরেক জা'কে রাঁধুনি বানানোর খবর[৬৮১] আমরা আগেই পেয়েছি। আবার যেখানে অসাম্য থাকে না, আকছা-আকছি ঘটতে পারে তুচ্ছ কারণেই। এমনকী বিনা কারণেও।

পড়ে পড়ে নষ্ট হলেও
দেব না তা জা'কে,
দিই না আর-যাকে। (সিন্ধি[১১৯])

অনেকে তো আগে থাকতেই ধরে নেয় যে, যে-ই জা হয়ে আসবে তার সাথে ওর লাগবেই। এমনকী নিজের বোন হলেও।

বোনকে করব নিজেরই 'জা',
বানাতে শত্রু আমার?
আমি কি অতটা চামার। (সিন্ধি[১২০])

এমনকী অবিশ্বাসের জের পরের প্রজন্ম অবধিও টানা হয়।

সতিন-কাঁটাও 'মা' মনে করে
ঘরে দিতে পারে ঠাঁই,
জায়ের ছেলেরা? না-না নারে বাবা,
ভরসা কোথায় পাই! (সিন্ধি[১২১])

সাত

মেয়েটাকে যদি এতটুকু সুখে
রাখ তুমি বাবাজীবন,
তোমার খাটের পায়াকেও ভালো
বেসে যাব সারাজীবন। (হিন্দি[১২২])

অ্যাঁ, কে বলল এটা? কে? কে?

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত মহিলার কথা হল তাদের মধ্যে যে-কেউ বলে থাকতে পারে বা ভবিষ্যতে বলতে পারে মেয়েকে জামাইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার সময়। স্নেহের পুত্তলিটা কোথায় না কোথায় চলে যাবে, কে জানে কেমন মানুষের হাতে পড়বে, শাশুড়ি-ননদ-জায়েদের কাছে কী রকম ব্যবহার পাবে—সেসব ভেবে মায়েরা কাঁটা হয়ে থাকে। অন্তত বরের দুর্ব্যবহার যাতে মেয়েকে সহ্য করতে না হয় তার জন্য সব শাশুড়িই জামাইকে মেয়ের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধটা করে।

কিন্তু যেসব শাশুড়ি বউদের অতিষ্ঠ করে তোলে, করার সময় ওরা কি নিজেদের মেয়েদের কথা ভেবে দেখে না?

হয়তো ভাবে। আর না ভাবলে হয়তো বউরাই সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে—"আমার পেছনে লেগো না, মনে রেখো তোমার মেয়েও বড়ো হচ্ছে (হিন্দি[১২৩])।" তবে এসব ভাবনা কোনও শাশুড়িকে কখনও নিরস্ত করেছে বলে শোনা যায় না। ওরা চায় ছেলের বউরা তাদের তাঁবেতে থাকুক আর তাদের নিজেদের মেয়েরা তাদের বরেদের কবজা করে ফেলুক। কারও কারও ক্ষেত্রে দুটোই না হোক এর একটা ঘটতেও পারে।

আমার মেয়ের বড়োই বাধ্য
জামাইটা কত ভালো!
ছেলেটা বোয়ের গোলাম হয়ে তো
মুখটা তার পোড়াল। (মারাঠি[১২৪])

ছেলে আর জামাইয়ের জন্য আলাদা মাপকাঠি রাখা যদি দোষের হয়, মেয়ে ও বউয়ের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি বোধ হয় তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে।

বউমাকে বলি, মেয়েকেও বলি
"কীসে মঙ্গল জেনো—
যেখানেই থাক আমার শেখানো
নিয়ম-কানুন মেনো।" (সিন্ধি[১২৫])

সে যা-ই হোক, সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে যদি মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের পটে যায়। তখন তো জামাইরা শাশুড়িদের নয়নের মণি হয়ে ওঠে।

ছেলে তো গর্ভে জন্মায়,
জামাই চোখের পরদায়। (সিন্ধি[১২৬])

শোনা যায় শাশুড়ি-জামাই সম্পর্কের রেকর্ডে নাকি কখনওই লাল দাগ পড়েনি। এমনকী—

কখনওই কোনও ডাইনি
তার জামাইকে খায়নি। (হিন্দি[১২৭], অংশত হিন্দি[১২৮])

এও শোনা যায় যে—

যদি কেউ গিয়ে শাশুড়ির কাছে
জামায়ের নাম করে—
চিতা থেকে উঠে পড়ে। (গুজরাতি[১২৯])

আর জামাই?

খাড়া করে তুমি দিতে পার ওই
ঝুঁকে পড়া গাছটাকে—
একটি 'জামাই' ডাকে। (তেলুগু[১৩০])

খোদ জামাইকে বলতে শোনা যায়—

শাশুড়ি ছাড়া এ জীবন পানসে,
যেমন হলুদ না দিলে মাংসে। (পাঞ্জাবি[১৩১])

সুতরাং এ-হেন জামাই যখন শ্বশুরবাড়িতে আসে, শাশুড়ির কাছে সেটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নিজে তো তাকে মাথায় তুলে নাচেই, চায় পাড়াপড়শিও তার ততটাই কদর করুক।

জামাই দেখতে এসেছ মেয়েরা
যাওনা সে আছে ওই ঘরে;
কিন্তু তোমরা ঢুকবে সবাই
লজ্জা-লজ্জা মুখ করে। (মারাঠি[১৩২])

শাশুড়ির মুখে জামাইয়ের প্রশস্তি শোনার মতো।

নিজের মুখে বলব কী ভাই
এটা তো সবার জানাই—
সোনা দিয়ে মাপলে তবে
মিলবে এমন জামাই। (হিন্দির[১৩৩] অংশ)

জামাইয়ের জন্য পিঠে বানালাম আর জামাই এল না, তার বদলে তার ভাই খেয়ে গেল—শাশুড়ির এই হতাশার মধ্যে জামাতৃ-স্নেহের যে পরিচয় আমরা বাংলায়[১৩৪] পেয়েছি তা অন্যত্রও মেলে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলে গরিবেরা সাধারণত বাজরা-জোয়ারই খায়, গমটা একটু শৌখিন ব্যাপার। তাই এক শাশুড়িকে চিড়বিড়িয়ে উঠতে দেখা যায়—

মিথ্যে গমটা খরচ করলি
ভাবলি এসেছে জামাই।
এ ছোঁড়া তো তার ভাই! (মারাঠি[১৩৫])

তবে জামাইদের বেশি লাই দেওয়ারও বিপদ আছে. অনেক সময় ওরা মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না।

আজব জামাই, আজব জামাইষষ্ঠী—
শালির বদলে শাশুড়ির সাথে
করছে ফস্টিনস্টি। (রাজস্থানী[১৩৬], অংশত মারাঠি[১৩৭, ১৩৮])

এমনকী এ কথাও বলে বসতে পারে—

কী শাশুড়ি-মা, নাতি-নাতনি চাও?
কোনও একটা গোল বাধিয়ে
লোকজন হটাও। (অংশত তামিল[১৩৯])

এমনকী অতি বড়ো বেয়াদপ হলে এও—

শ্বশুরবাড়ি এসে আমার
লাগছে বড়ো একা,
মেয়ে যদ্দিন খুকি আছে
দাও শাশুড়ি ঠ্যাকা। (হিন্দি[১৪০])

না না ওসব অশৈলী কাণ্ডের কথা থাক। আমরা তো জানিই বেশির ভাগ জামাই শাশুড়িদের মায়ের মতোই মনে করে। শাশুড়িরাও ওদের মায়ের চোখেই দেখে। তবে এখানে একটা অন্য সমস্যা হয়। শাশুড়ির এত আদর-যত্ন পেয়ে জামাই ভেবলে গিয়ে ভাবে— কই, আমার নিজের মা তো আমায় এত বেশি ভালোবাসে না! ব্যাস্ ওরা শাশুড়ির খপ্পরে পড়ে যায়। অনেকেই বনে যায় 'শাশুড়ির জামাই'[১৪১]।

মা আর শাশুড়ির মানসিকতার মূল পার্থক্যটা এরা বুঝতে পারে না, যা বহুকাল আগে এক অজ্ঞাতনামা ভূয়োদর্শী সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

মা সুখ পায় দেখে ধুলো-মাখা ছেলে,
শাশুড়ির সুখ সুবেশে জামাই এলে। (সিন্ধির[১৪২] অংশ)

অর্থাৎ মায়ের প্রধান আনন্দ—দুরন্তপনা করে ধুলো মেখে আসা শিশুকে দুরন্ত করে তোলার মধ্যে, যা লালন পালনের প্রতীক। আর শাশুড়ির তৃপ্তি—ফিনিশ্ড প্রডাক্ট হিসেবে দশজনকে দেখানোর মতো জামাই বাগাতে পারায়।

তা ছাড়া জামাইয়ের যা কিছু মূল্য তা 'মেয়ের বর' বলেই তো! তাই এ প্রশ্ন সবসময়ই রয়ে যায়—

মেয়ে মারা গেলে পরে—
জামাইকে কেউ তখন কি আর
আত্মীয় বলে ধরে? (ওড়িয়া[১৪৩], তুলনীয় বাংলা[১৪৪])

কোথাও কোথাও তো খুবই নিষ্ঠুর কথা শোনা যায়। যেমন—

যেই মেয়ে মরে ওর—
জামাইকে বলে চোর। (হিন্দি[১৪৫])

এ তো গেল সেইসব জামাইয়ের কথা যারা শ্বশুরবাড়িতে স্বাগত। আরেক ধরনের জামাই আছে যারা এমনিতে খারাপ লোক না হলেও ওদের আসার কথা শুনলে সবাই গম্ভীর হয়ে যায়। কেননা সংস্কার বশতই ওরা শ্বশুরবাড়িটাকে একটা দীর্ঘমেয়াদি নেমন্তন্ন বাড়ি বলে মনে করে। এরা হয়তো নিজেদের বাড়িতে ডাঁটা-চচ্চড়ি দিয়েই এক থালা ভাত তুলে দিতে পারে, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এলেই এরা এক একজন শাহেনশা। আমরা বাংলার[১৪৬] এক শ্রেণীর জামাইয়ের কথা জানি যারা পঞ্চব্যঞ্জন ছাড়া খেতে পারে না। ওরকম সর্বত্রই আছে।

যত ব্যঞ্জনই সাজিয়ে দাওনা
লাট সাহেবের পুত—
করবেই খুঁতখুঁত। (মারাঠি[১৪৭])

এইসব জামাইকেই দেবভাষায়[১৪৮] বলা হয়েছে 'দশম গ্রহ'—কন্যারাশিতে যাদের অবস্থান, সবসময়ই যাদের বক্রগতি, সবসময়ই যারা রুষ্ট থাকে ও পুজো পেতে চায়।

ওদের খাঁই কীরকম?

জঙ্গলে ষাঁড় যতটা খায়
শ্বশুরবাড়িতে ওরা তা চায়। (তেলুগু[১৪৯])

রেস্ত থাকলে হয়তো শ্বশুররা ওদের খাইয়ে তৃপ্তিই পায়, কিন্তু না থাকলে জেরবার হয়ে যায়। অথচ উপায়ও থাকে না।

গমের দাম সে যতই হোকনা
টাকায় সের বা মন,
জামাই এলে তো খাওয়াতেই হবে
বালাই সে এমন। (পাঞ্জাবি[১৫০])

ফলে বিরক্তির সীমা থাকে না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে লোকটা কে, হয়তো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—

লোকটা আমার জামাই—
গেলায় নেইকো কামাই। (কন্নড়[১৫১])

জামাইদের খাওয়ানোর ব্যাপারে শাশুড়িরা একটু বাড়াবাড়ি রকমের উৎসাহ দেখিয়েই থাকে (অসমিয়া[১৫২])। তাই কোনও কারণে জামাই বাড়িতে এক বেলা না খেলে যদি শাশুড়ি উতলা হয়, শ্বশুর হয়তো খিঁচিয়ে ওঠে—

জামাই না খায় যদি
পাছায় ফোটে কি গদি? (গুজরাতি[১৫৩])

জামাইয়ের ফরমাশ শুনলে পিত্তি চটে যায়।

জামাই খাবে পরমান্ন,
দুধ দেবে ষাঁড় তাই জন্য! (মারাঠি[১৫৪])

খাওয়ার ব্যাপারে তৎপরতা দেখলে অসহ্য লাগে।

পাতা দিলেই বানিয়ে ফেলে দোনা,
কী সেয়ানা আমার জামাই-সোনা! (মারাঠির[১৫৫] অংশ)

ধার-ধোর করে এ-জিনিস দেখা এক অভিজ্ঞতা—

বাড়ির সবাই অনাহারে
বাজরা ঘরে কই!
জামাই-বেয়াই জামবাটিতে
সাঁটছে ঘন দই। (মারাঠি[১৫৬])

আর, এইসব জামাইয়ের দায় যখন গরিব বিধবা শাশুড়িদের নিতে হয়?

শাউড়ির হাল যখন এমন
চাটছে বসে হাঁড়ি,
লিখল জামাই—পুজোর সময়
আসছে শ্বশুরবাড়ি। (তেলুগু[১৫৭])

এ জামাইকে হয়তো আসতে বারণ করে দিলে নিস্তার দেবে, কিন্তু যেসব জামাই অপ্রতিরোধ্য?

এবারও জামাই-ষষ্ঠীতে যদি
শাশুড়ি মাগি না ডাকে,
চুলের মুঠিটা আচ্ছাসে ধরে
জুতিয়ে ছাড়ব তাকে। (তামিল[১৫৮])

প্রবাদের জগতে জামাইদের খাওয়া নিয়ে শ্বশুরদের অনেক বিরক্তির কথা শোনা গেলেও একটি শ্বশুরের খবর পাওয়া যায় যে এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। অবশ্য সব দিক থেকেই সে অনন্য।

ছেলের সঙ্গে লেখাপড়া সেরে
জামায়ের সাথে খেতে বসে পড়ে। (কন্নড়[১৫৯])

তবে আরও এক শ্রেণির জামাই আছে যাদের চেয়ে বড়ো বালাই আর হয় না। তারা শুধু দশম গ্রহের মতো পুজো পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, সমানে নৈবেদ্যের জোগানও চায়। উপঢৌকন তো বটেই, নানান ছুঁতোয় নগদও।

জামাই কাউকে দেয় না ছাড়,
করেই ছাড়ে সে ঘর উজাড়। (কন্নড়[১৬০])

এইসব জামাইয়ের নামে শ্বশুরদের হৃৎকম্প হয়।

জামাই থাকা মানেই ফাঁড়া—
মাথার ওপর ঝুলবে খাঁড়া। (সিন্ধি[১৬১])

জামাইয়ের খাঁই কখনও মেটবার নয়।

যতই দাওনা জামাইকে তা
বালিতে মূত্রপাত,
আরও সে পাতবে হাত। (কোঙ্কনি[১৬২])

কীভাবে যে কী বাগিয়ে নেয় জামাই, শ্বশুর ঠাওরই করতে পারে না।

বাবাজীবনের মতি
নদীর বক্রগতি। (ওড়িয়া[১৬৩], সংস্কৃতর[১৪৮] অংশ)

যা পেল না তার জন্য রাগের শেষ নেই, যা পাচ্ছে তার জন্য এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

জামায়ের কাছে খালি
শ্বশুরেরা পায় গালি। (কাশ্মীরি[১৬৪])

এ কাকে এনেছে মেয়ে—
জুতো মাবে খেয়ে দেয়ে? (গুজরাতি[১৬৫])

সত্যি সত্যি জুতো হয়তো মারে না, কিন্তু শ্বশুরকে এটা ভালো করেই মালুম পাইয়ে দেয় যে—

জামাইরা আসে ধরাতে
শ্বশুরের আয়ু হরাতে। (কন্নড়[১৬৬])

শাশুড়িদেরও ভক্তি চটে যেতে দেরি হয় না।

ভাত হয় না তিলে
জামাই হয় না ছেলে। (মারাঠি[১৬৭])

তেএঁটে জামাই জোটে
কঞ্চি হয়ে সে ফোটে। (সিন্ধি[১৬৮])

জামাই-আদর ব্যাপারটাকেই অপচয় বলে মনে হয়।

জামাই করলে চান—
লাভের মধ্যে এইটুকু হয়
জলটা পায় বাগান। (মারাঠি[১৬৯])

কিন্তু এইসব হাড়ে-বজ্জাতকে সহ্য করে কী করে শ্বশুরেরা?

বাসি রুটি খায় দইয়ের জন্যে,
জামাইকে সয় সাধে যে কন্যে! (মারাঠি[১৭০])

উচিত জবাবটা জামাইকে যে দেওয়া যায় না, সেটা শুধু মেয়ের মনে লাগবে বলে নয়, এর জের মেয়েকে সহ্য করতে হবে বলেও। যে-কোনও বেআক্কেলে কাজের উদাহরণ হিসেবেই বলা হয়—

মেয়ে দিয়েছে যাদের হাতে
লড়তে গেছে তাদের সাথে। (সিন্ধি[১৭১])

কিন্তু মেয়েরা নিজেরা প্রতিবাদ করে না?

কেউ কেউ হয়তো করে, কিন্তু শত্রুপুরে থেকে তা আর কতটা সম্ভব? তাই হয়তো নিজের মনেই গজগজ করে তারা—

বরটা আস্ত কসাই!
কেবলই মন্ত্র জপে—
"বোয়ের বাপকে ধসাই।" (হিন্দি[৭৭২])

তবে বেশির ভাগ মেয়েরই ধাত অন্যরকম। তাদের সম্পর্কে বলা যায়—

বর যা-ই বলে সেইমতো চলা
বুদ্ধির কাজ বটে,
তবে সেইটুকু বুদ্ধি থাকে তো
সব মেয়েদেরই ঘটে। (অসমিয়া[৭৭৩])

তাই অনেক মেয়েই বরের মর্জিটা বুঝে ওসব ব্যাপারে চুপই থাকে।

আবার এমনও অনেক মেয়ে আছে যারা খিঁচে নেওয়ার খেলায় নিজেরাও দড়িতে হাত লাগায়, বিশেষ করে যদি দেখে অন্য দাবিদারও আছে। যেমন, কেউ হয়তো মাকে গিয়ে ধরে—

বউকে তো দাও বস্তা ঝেড়ে,
দাওনা আমায় কস্তাপেড়ে! (হিন্দি[৭৭৪])

জামাইয়ের বড়ো বড়ো দাঁও মারার পাশাপাশি যদি মেয়েরও খুচখাচের মাত্রা বাড়তেই থাকে, অচিরেই বাবা-মা জেনে যায় যে "মেয়ে মানেই ক্ষুর (কাশ্মীরি[৭৭৫])" এবং এই সিদ্ধান্তে আসে যে—

আইবুড়ো শুধু
রুটিটুকু খায় বারো মাস,
বিয়ে হলে খায়
খুবলে খুবলে হাড় মাস। (পাঞ্জাবি[৭৭৬])

এইসঙ্গে মায়ের হয়তো মনে পড়ে যায় অতীতে শোনা এক সাবধানবাণী—

বাড়িও না মায়া কন্যার প্রতি বেশি—
বিয়ে হলে সে তো হয়ে যাবে পর,
যেন কোনও প্রতিবেশী। (উর্দু[৭৭৭])

তবু মায়ের-প্রাণ বলে কথা, তাই এত সবের পরেও অনেক মায়ের মনই 'মেয়ে-মেয়ে' করতে থাকে এবং দেখে যে মেয়েরা তাদের পাত্তা না দিয়ে শুধুই 'ওগো-ওগো' করে যাচ্ছে (কাশ্মীরি[৭৭৮], তুলনীয় বাংলা[৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১])। কিন্তু এমন মায়েরও খোঁজ পাওয়া যায় যারা শেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মেয়ে-জামাইকে খরচের খাতায় তুলে দিয়ে বলে—

চুলোয় যাকগে মেয়ে-জামাই!
ওরা আমাদের পর,
হে মা লক্ষ্মী, ছেলে-বউ যেন
পায় গো তোমার বর। (অসমিয়া[৭৮২])

এবং এমন বাপও আছে যারা বলতে নেই, মেয়ের সিঁদুরের মায়াও করে না।

এত প্রিয় ছিল
ঠাকুরদাদার লাঠি এ,
আহা ভেঙে গেল
জামাইয়ের মাথা ফাটিয়ে। (তামিল[১৮৩], অংশত তেলুগু[১৮৪])

এক ঋষিবাক্যে[১৮৫] পাঁচটা বিশ্বাসঘাতকের যে তালিকা আছে তাতে কৃষ্ণসর্পেরও আগে জামাতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেটা বোধ হয় এই জন্য যে, লাঠি না ভেঙেও সাপ মারা যায়, কিন্তু জামাইকে যায় না।

তবে জামাই মানেই যে মেরুদণ্ডহীন বজ্জাত, এ কথা বললে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। কেননা এমন জামাইয়েরও খবর প্রবাদের জগৎ থেকে পাওয়া যায় যারা তেড়িয়া হয়ে বলতে পারে—

এত বড়ো লাশ হয়েছে আমার
সে কি শাশুড়ির খেয়ে?
প্রাণ দেওয়া ভালো এই অপবাদ
মাথায় নেওয়ার চেয়ে। (অংশত কন্নড়[১৮৬])

কিন্তু জামাই যত ভালো হবে তত বেশি মান পাবে এমন কথা বোধ হয় জোর দিয়ে বলা যায় না। কেননা জামাইদের স্ট্যাটাস অনেকখানি নির্ভর করে তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর।

দূরের জামাই যত মান পায়
কাছেরটা তার আধা,
ঘরে যেটা থাকে ফাইফরমাশ
খেটে বনে যায় গাধা। (বিহারি[১৮৭])

মান পাওয়ার গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করে কে কতটা সহজলভ্য তার ওপর। যারা একই গাঁয়ের জামাই তাদের ট্র্যাজেডি গেঁয়ো-যুগিদেরই মতো। বাড়িতে যখন তখন এসে হাজির হলে যা হয় আর কী।

শ্বশুরবাড়িটা কাছে হওয়া মানে
ঘন ঘন আসাআসি,
জামাইকে নিয়ে তারই বউ তাই
করে বড়ো হাসাহাসি। (গুজরাতি[১৮৮])

আসাআসির মাত্রাটা খুব বেশি হলে হাল বড়োই খারাপ হয়।

দূরের জামাই কত সেবা পায়—
শালি বনে যায় আঠা,
ওই একই গাঁয়ে থাকে যে জামাই
শালি তাকে ভাবে পাঁঠা। (হিন্দি[১৮৯], অংশত বিহারি[১৯০])

কিন্তু দূর-জামাইদের হালও বিশেষ একটা ভালো হয় না যদি ওরা মাত্রাটা ঠিক না রাখতে পারে। সেই কোন যুগে কোনও এক ঋষিবাক্যে[৭৯১] শোনা গেছে—শ্বশুরবাড়িতে পাঁচ-ছ'দিন থাকলে তা স্বর্গতুল্য, কিন্তু কেউ যদি চর্ব্যচোষ্যের লোভে থাকার মেয়াদটা বাড়াতে চায় তা হলেই মুশকিল। বাংলাতেও[৭৯২] একটা জায়গায় সময় সীমাটা একইরকম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরেকটা জায়গায়[৭৯৩] বলা হয়েছে তিন দিন পরে প্রাপ্য হয় ঝাঁটার বাড়ি এবং রাজস্থানে[৭৯৪] দু'দিন পরেই জুতোর বাড়ি। অন্যত্র (হিন্দি[৭৯৫]) দেখা যায় শ্বশুরের সহ্যশক্তিতে যে পার্থক্য থাকতে পারে সে কথা মাথায় রেখে মেয়াদটাকে আলগাভাবে দু-চার দিন বলা হয়েছে।

তবে ঘরজামাইদের মতো অতখানি হেনস্তা বোধ হয় দুনিয়ায় কাউকেই করা হয় না। পরনির্ভরশীলদের কপালে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার জুটবে কী করে? বাংলাতেও[৭৯৬] তো এরা 'আধা-চাকর' আখ্যা পেয়েছে।

ওদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন, নিজের শ্বশুরই হয়তো কারও সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলল—

জামাই আমার পরিবারেরই অংশ,
কাজ বলতে শুধুই অন্নধ্বংস। (হিন্দি[৭৯৭])

কিংবা—

ঘরজামাইকে ডেকে শ্বশুর
বলে "ওহে মেধো!
দূর-জামাইকে আরও খেতে
পায়ে ধরে সেধো।" (হিন্দি[৭৯৮])

এক বাঙালি[৭৯৯] শাশুড়ির কথা আমরা জানি—সে আর তার মেয়ে নিজেরা সব খেয়ে নিয়ে ঘরজামাইয়ের খাওয়ার জন্য ধান শুকোতে দিয়েছিল। অতটা নিষ্ঠুরতা না হলেও চিরাচরিত প্রথা ভেঙে বরের আগে বউয়ের খেয়ে নেওয়ার খবর অন্যত্রও পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়—

তুলে দেওয়া হয় জামায়ের পাতে
পাতে যা-যা ফেলে মেয়ে—
চুপচাপ নেয় খেয়ে। (ওড়িয়া[৮০০])

ঘরজামাইকে কেউই ভালো চোখে দেখে না।

একটা মোষের শিং বড়ো হলে
ঝামেলায় পড়ে মোষের পাল,
একটা জামাই ঘরে ঠাঁই পেলে
গোটা পরিবার হয় বেহাল। (তেলুগু[৮০১])

খেত বরবাদ হয় যদি তাতে
ঢোকে সরষের চারা,
ঘর বরবাদ হয় যদি ঢোকে
জামাই হতচ্ছাড়া। (গুজরাতি[৮০২])

কুকুরের মতো কুকুর চাই?
ওই তো রয়েছে ঘরজামাই। (ওড়িয়া[৮০৩])

তবে একটা ব্যাপারে ঘরজামাইরা ভাগ্যবান যে, 'কুকুর' অভিধায় ওরা সবসময়ই সঙ্গী হিসেবে আরও কয়েকজনকে পায়। আর কাউকে না হোক, অন্তত বোন বা দিদির বাড়িতে গেঁড়ে বসা এক দাদা বা ভাইকে ওরা পাবেই দোসর হিসেবে (ওড়িয়া[৮০৪])। নানা জায়গা থেকে এই কুকুর-জুটির খবর আসে। কোথাও তাদের সঙ্গে কুকুর হিসেবে যোগ দিয়েছে ভিখিরি (বিহারি[৮০৫]), কোথাও মামার বাড়িতে বডি ফেলা ভাগনে, এমনকী কোথাও কোথাও কুকুর-পরিবারের প্রতিপালকও (হিন্দি[৮০৬, ৮০৭])। তবে কুকুরের সবচেয়ে ছন্দোময় জোটটা হল—

একটা কুকুর ঘরজামাই,
একটা বোনের বাড়িতে ভাই,
সব কুকুরের পালের গোদা
জামাইবাড়িতে নিয়েছে ঠাঁই। (পাঞ্জাবি[৮০৮])

তবে ঘরজামাই মানেই যে সবসময় মাটির সঙ্গে মিশে থাকবে তা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, বাড়িতে এদের বেশিরভাগেরই স্ট্যাটাস এত খারাপ হয় যে ওদের প্রায় দাসানুদাস বললে চলে, কেননা কাজের লোকেদেরও খোশামুদি করে ওদের টিকে থাকতে হয় (উর্দু[৮০৯])। কিন্তু আরেকটি সংখ্যালঘু শ্রেণি আছে যারা এমন দাপটের সঙ্গে থাকে যে, তেড়িয়া হয়ে বলতে পারে—"আমার শ্বশুরবাড়ির ঝিয়েদের আমি ঠ্যাঙাব, তার জন্য শ্বশুরের পার্মিশন নিতে হবে নাকি (তামিল[৮১০])?"

এরা নিজেদের আশ্রিত বলে স্বীকার করে না, বরং এমন ভাব করে যেন এরা হাল ধরেছে বলেই শ্বশুরবাড়িটা টিকে আছে। আর, যদিও ঋষিবাক্য অনুসারে "শ্বশুরের কীর্তির দৌলতে পাওয়া খ্যাতি অধমতম (সংস্কৃত[৮১১], অসমিয়া[৮১২])", শ্বশুরের বৈভবের জন্য ওদের বেশ গর্ব থাকে। অধিকারবোধও থাকে, তাই যখের ধনের মতো আগলে রাখতে চায়।

যে-পুরুষটা শ্বশুর-ঘর করে
কুকুর হয়ে পাহারা দেয় দোরে। (কাশ্মীরি[৮১৩])

এরা ঠিক 'ফলনার জামাই'[৭৯৬] না হলেও এদের মুখ থেকে বাপ-দাদার কোনও খবর পাওয়া যায় না। এদের ঘিরে একটা রহস্য থাকে বলে প্রায়শই এদের নিন্দেমন্দ করা হয় রহস্যময় ভাষায়। যেমন—

বাপকে মেরে শ্বশুরবাড়িতে ছ'মাস বাস—
পিতৃহত্যার মহাপাতক করবে নাশ। (তামিল[৮১৪])

যারা শ্বশুরবাড়ি থেকে এত পায়, শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি নিশ্চয়ই খুব টান থাকে তাদের? কই, প্রবাদের জগৎ থেকে তেমন তো কোনও খবর পাওয়া যায় না। বরং শোনা যায়—

কাছে থাকলেই হয় না টান
কনুই ছুঁতে পারে না কান;
শাশুড়ির শোকে ঘরজামায়ের
কোনও দিন কেঁদে ওঠে না প্রাণ। (মারাঠি[৮১৫])

আট

এ পর্যন্ত পোষ্য শালাদের কথাটা নেহাতই ঘরজামাইদের লেজুড় হিসেবেই এসেছে বলে ওদের পার্শ্বচরিত্র মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং ওদের হেনস্তা করা হয় তো ঘরজামাইদের চেয়েও বেশি।

এ তো সবাই জানে "ঘরজামাই, পোষ্য শালা দুজনেই পরের এঁটো খায় (ওড়িয়া[৮১৬])", কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখেছি ঘরজামাই খায় নিজেরই বউয়ের এঁটো, তা হলে তো দাঁড়াচ্ছে পোষ্য শালা খায় যার-তার এঁটো।

পোষ্য শালাদের বিধ্বংসী ক্ষমতাও কম নয়। খোদ দেবভাষাতেই বলা হয়েছে "শ্যালক গৃহনাশ করে এবং মাতুল করে সর্বনাশ।"[৮১৭] দ্বিতীয় গোত্রও তো "বাপের জবানিতে শালা।" তাই দেখা যায় শালার কীর্তির কথা উঠলে প্রায়ই মামাকেও টেনে আনা হয়।[৮১৮]

কিন্তু শালারা আদতে কী করে?

কুলুঙ্গি তো দেয়ালে ঢুকে
দেয়ালটাকে ধসায়,
বড়োকুটুম বাড়িতে ঢুকে,
সংসারটা ভাসায়। (হিন্দি[৮১৯], রাজস্থানী[৮২০], পাঞ্জাবি[৮২১])

কিন্তু কীভাবে?

এটা বুঝতে হলে গোড়া থেকে দেখতে হয়।

আমরা জানি, এমন অনেক জামাই আছে যাদের শ্বশুরবাড়ির যে-কোনও জিনিসই সহজে পেড়ে ফেলতে পারে।

শ্বশুরবাড়ির কাউয়া
দেখে মোহিত বউয়া। (হিন্দি[৮২২])

তাই শালারা এ-হেন ভগ্নীপতিদের কলজের ভেতর সহজেই সেঁধিয়ে পড়তে পারে। যেহেতু শালাদের নিজেদের তেমন কোনও দুর্বলতা থাকে না, একবার ঢুকে পড়লে কিছু হাতিয়ে না নিয়ে কি আর বেরোতে পারে?

ভগ্নীপতি শালার নামে গলে,
শালা গোছায় উপকারের ছলে। (হিন্দি[৮২৩], অংশত তামিল[৮২৪])

তবে এ এক উঁচুদরের শিল্প, প্রচুর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। প্রথমে তো মিহি মোলায়েম ব্যবহারেই কবজা করে ফেলতে হয়, যাতে মোহিত হয়ে ভগ্নীপতি ভাবে—

শালার কত নরম ব্যবহার—
মাখনও তার কাছে মানে হার। (মারাঠি[৮২৫])

ভগ্নীপতির ভালো কীসে হয় তা নিয়ে ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে যেতে হয়। থেকে থেকেই অনুযোগ করতে হয় যে, জামাইবাবু শরীরের যত্ন নেয় না, বড্ড বেশি খাটে ইত্যাদি। সেইসঙ্গে আরও কিছু টুকটাক।

বিষম লেগে ভগ্নীপতির
হল একটু কাশি,
'হাঁ-হাঁ' করে উঠল শালা
হচ্ছে যেন ফাঁসি। (হিন্দি[৮২৬])

এরকম কয়েকটা চালেই ভগ্নীপতি কুপোকাত হয়। ভাবে, কই মায়ের পেটের ভাইরাও তো আমাকে নিয়ে এত ভাবিত নয়। একসময় তার আর কোনও সন্দেহই থাকে না যে—

বড়ো কুটুম ভায়ের চেয়ে মিষ্টি,
ভগবানের সবচে' বড়ো সৃষ্টি। (হিন্দি[৮২৭])

অবশ্য ভাই বলতে এখানে শুধু সহোদরদেরই কথা বলা হচ্ছে, কেননা দাক্ষিণাত্যে তো তুতো-ভাইয়েরাও শালা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে—

ভায়ের রাজা মামাতো ভাই,
হও যদি তার জামাতো ভাই। (তেলুগু[৮২৮])

কোনও কোনও শালা তো শোনা যায় শালিদের মোহিনী শক্তিকেও হার মানায় এবং কারও কারও কাছে "কুটুমের মধ্যে শালাই"[৮২৯] প্রথম স্থান পায়।

তাদের রাজা খিচুড়ি
যা-যা ফোটে হাঁড়িতে,
শালাই হল মধ্যমণি
বোয়ের বাপের বাড়িতে। (কাশ্মীরি[৮৩০])

এমনকী এক শালাভক্তকে তো এমন পরামর্শও দিতে শোনা যায়—

লক্ষ টাকার ঝুলি নিয়েও সম্বন্ধ এলে—
'না' বলবে না থাকলে মেয়ের বাপের ছেলে। (তেলুগু[৮৩১])

বলাই বাহুল্য এতখানি সম্বন্ধী-প্রেমকে বাড়ির লোকেরা বাঁকা চোখেই দেখে। সম্ভবত শালাকে নিয়ে কোনও রাশভারি প্রকৃতির দাদার আদিখ্যেতা দেখেই কেউ বলেছিল—

অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রক্তচক্ষু বাঘ,
তারও আহা শালার প্রতি কত্ত অনুরাগ! (সিন্ধি[৮৩২])

ব্যাপারটা হাসি ঠাট্টার পর্যায়ে ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না শালারা ভগ্নীপতিদের দুর্বলতাকে তাদের ভাইবোনেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করতে শুরু করে। সেটা ঘটলে মন্তব্যগুলো আর নির্বিষ থাকে না। দাদার শালার খোঁচা খেয়ে হয়তো ভাইবোনেরা বলে—

বর্শা যেমন অমোঘ 'হাতিয়ার'
শালাই ওনার সবচে' বড়ো ইয়ার। (মারাঠি[৮৩৩])

কিংবা হয়তো লোকটার কুচুক্কুরেপনার দিকে ইঙ্গিত করে বলে—

হয় না স্যাঙাত শালার চেয়ে ভালো,
হয় না কিছুই চুলের চেয়ে 'কালো'। (তামিল[৮৩৪])

কিংবা আদিখ্যেতাটা যে মাত্রা ছাড়াচ্ছে সেটা বোঝাতে বলে—

এস্‌ছে বোয়ের ভাই
এক পাতে ভাত খাই। (মারাঠি[৮৩৫])

বোয়ের খাতিরে কল্লাম
ছোটো শালাকেও পেল্লাম। (ওড়িয়া[৮৩৬])

কিংবা শালার ওপর অত্যধিক নির্ভরতাকে কটাক্ষ করে বলতে পারে—

হেলায় শিখর করবে জয়
শ্যালক যদি সঙ্গী হয়। (তামিল[৮৩৭])

কিংবা শালার দেওয়া উপদেশ নিয়ে বিদ্রুপ করে বলতে পারে—

দিচ্ছে শালা বুদ্ধি—
গরু খেলে মুখশুদ্ধি। (হিন্দি[৮৩৭])

তা হলে কি ভগ্নীপতি-প্রেম মানেই ধান্দাবাজি?

তা হতে যাবে কেন? কত সোনার চাঁদ শালাকে, কত উপকারী শালাকে আমরা নিজের চক্ষে দেখি। এমনকী এমন শালারও তো খবর পাওয়া যায় যাদের জন্য ভগ্নীপতির দাদারও বুক গর্বে ফুলে ওঠে।

"কটা তোমার ছেলেপুলে লালা?"
"দুটো ছেলের বাপ ভায়ের শালা।" (রাজস্থানী[৮৩৮])

তা ছাড়া একদিক থেকে দেখলে ভাইদের চেয়ে শালাদের প্রেমই তো বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হওয়া উচিত। কেননা—

শালারা চায় বোনটি থাকুক
চিরটাকাল এয়ো,
ভাইরা বলে টাকা রেখে
জলদি চলে যেয়ো। (তেলুগু[৮৩৯])

তা সত্ত্বেও লোকেরা শালাদের সন্দেহের চোখেই দেখে। শালার সঙ্গে বেশি মাখামাখি দেখে ভুরু কোঁচকায়।

ভাইকে ছেড়ে শালার সঙ্গে করছে সাঁট,
আখের চেয়ে মিষ্টি বেশি আখের গাঁট। (অংশত পাঞ্জাবি[৮৪০] ও তামিল[৮৪১])

শালাদের অকৃতজ্ঞ ভাবাই দস্তুর।

শালাকে কিছু দিলে
নদীই নেবে গিলে। (পাঞ্জাবি[৮৪২])

'শালা' তো একটা সর্বভারতীয় গালি হয়ে উঠেছে। পরশুরামও 'মার শালাকে'-কে এক মহামন্ত্র বলে মনে করতেন। সর্বত্রই কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্য শালাদের টেনে আনা হয়।

'কালো' মানেই তবে
ভূতের শালা হবে? (গুজরাতি[৮৪৩])

অ-দেখা চোর পালায়
বদনাম পায় শালায়। (হিন্দি[৮৪৪])

অবশ্য অ-দেখা চোরকে অন্যত্র পিতৃসমানও বলা হয়েছে (হিন্দি[৮৪৫])। এমনকী আরেকটা জায়গায় কেষ্ট ঠাকুরেরও দেখা পাই।

কালা কালা কালা—
শ্রীকৃষ্ণের শালা। (রাজস্থানী[৮৪৬])

চুরির বদনামের কথায় বলতে হয়, সবসময় কিন্তু তা ভিত্তিহীন হয় না এবং সত্যি হলে ভগ্নীপতিরাও কিন্তু ছেড়ে কথা কয় না। কারও কারও শাস্তির ধরনে বেশ অভিনবত্বও দেখা যায়।

চোর ঠ্যাঙাতে বউকে বলে
লোকটা নিজের শালা হলে। (রাজস্থানী[৮৪৭])

শালাদের প্রতি এমন এক অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে, কেউ কেউ তো বাড়ির বউকে তাদের সঙ্গে বাপের বাড়ি যেতে দিতেও নিষেধ করে।

যার সঙ্গে বউকে পাঠাও
সে যদি হয় শালা,
তবে তুমি দিচ্ছ জেনো
হোগলার ঘরে তালা। (বিহারির[৮৪৮] অংশ)

তবে সব ভগ্নীপতিকে সাবধান করে দিতেও হয় না। শালা-ভক্তরাও যেমন আছে তেমনি এমন লোকও আছে যারা শালাদের উপদ্রব-বিশেষ বলে মনে করে। বিরক্ত হয়ে তারা হয়তো বলে—

চাবির সঙ্গে থাকে যেমন তালা
বোয়ের সঙ্গে জুটেই থাকে শালা। (হিন্দি[৮৪৯])

কত ভগ্নীপতি তো শালাদের প্রতি রীতিমতো খড়্গহস্ত। কত শালার মুখে শোনা যায়—

জামাইবাবু দেখতে আমায়
পারে না দু-চক্ষে,
ভাগ্যে দিদি পেয়েছি এমন
তাই কিছুটা রক্ষে। (হিন্দি[৮৫০], তুলনীয় তামিল[৮৫১])

তার মানে কিন্তু এ নয় যে সব ভগ্নীই ভ্রাতা বলতে অজ্ঞান। বরং ছোটোবেলা থেকে

দেখে আসছে বলে অনেকেই ভাইদের হাড়ে হাড়ে চেনে এবং স্বামীর সঙ্গে আঁতাত ঘটতে দেখলে কু-ডাক শুনতে পায়। তাই প্রায়ই এরকম ঘটতে দেখা যায়—

বোনাই করে গলাগলি,
বোনটি করে চুলোচুলি। (হিন্দি[৮৫২])

আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, ভাই বা দাদার প্রতি তেমন কোনও বিরূপতা না থাকলেও টানও বিশেষ থাকে না।

একটু সেবা পাওয়ার লোভে
বোনের বাড়ি যাওয়া,
স্বামীর কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে
বোনটি হল হাওয়া। (তামিল[৮৫৩])

আবার আরেক রকম মেয়ে আছে যারা দাদা বা ভাই এলে খুশিই হয়, কিন্তু ওরা যে শুধুমুধু অন্নধ্বংস করে যাবে সেটি হবে না। তাই কোথাও কোথাও রেওয়াজই আছে দিদি বা বোনের বাড়িতে খেতে হলে চাল নিয়ে যাওয়ার। নেহাত হাভাতে যদি না হয় নিয়ে গেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, কিন্তু কোনও কোনও দাদা বা ভাই ওটুকু ছাড়তেও রাজি নয়। ঘাড় গোঁজ করে বসে থেকে বলে—

খেতে হলে যদি চাল দিতে হয়
বোনের বাড়িতে খাব কেন?
আর বুঝি কেউ নেই যেন! (কন্নড়[৮৫৪], মলয়ালম[৮৫৫])

তবুও বলতে হবে ভাই-বোনের সম্পর্কটাই যা টেকে, বোনাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা নেহাতই শর্তসাপেক্ষ।

বোনাই আপনজন
যদ্দিন আছে বোন। (তামিল[৮৫৬])

ভায়রাভাই। ভায়রা-ভায়রা জুটিটারও দম কম ছিল না, কিন্তু বাংলা প্রবাদের জগতে এরা তেমনভাবে খবর হয়ে উঠতে পারেনি। যতদূর জানি এখানে[৮৫৭] ওদের মাসতুতো ভাইদের মতো একজোড়া চোরই শুধু বলা হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম ভারতে ওরা প্রাণের দোসর।

না, ওই অঞ্চলের জল হাওয়ায় এর কারণ খুঁজতে যাওয়া বৃথা, বরং চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে এই আঁতাতের মূলে রয়েছে নিছকই এক ধ্বনিগত সাদৃশ্য। পশ্চিম ভারতে ভায়রাভাইকে বলা হয় 'সাড়ু' আর লাড্ডুকে 'লাড়ু', সুতরাং লাড়ুর মধ্যস্থতায় ওরা গাঁটছড়া তো বাঁধবেই। এমনকী একটা খবরে সেরা কুটুম 'সাড়ু' ও সেরা মেঠাই 'লাড়ু'র পাশে সেরা হাতিয়ার হিসেবে জায়গা পেয়েছে হেঁসো, যেহেতু মারাঠিতে তাকে বলে 'মাড়ু'।

তা হলে আমাদের বাঙালি ভায়রারাই বা পিছিয়ে থাকে কেন? ময়রার সন্তান লাড্ডুকে 'মায়রা' বললেই তো তাদের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা যায়। বলা যায়—

মেঠাইয়ের রাজা 'মায়রা',
কুটুমের রাজা ভায়রা। (মারাঠি[৮৫৮], গুজরাতি[৮৫৯])

পাতে পড়েছে 'মায়রা',
ভোজনসঙ্গী ভায়রা। (মারাঠি[৮৬০])

অবশ্য এমনিতেও আমরা বলতে পারি—

আছে যত হাতিয়ার সেরা হল হেঁসো,
কুটুমের সেরা হল ছেলেটার মেসো। (মারাঠির[৮৬১] অংশ)

খাওয়ার সময় ভায়রাভাই,
কাজের সময় পালিয়ে যাই। (বিহারি[৮৬২])

তবে ভায়রা-প্রেমের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণই কি নেই? বরং বেশি মাত্রায় আছে এবং এরকম একটা সন্দেহ হতেই পারে যে, পূর্বোক্ত বিবৃতিগুলোতে লাড্ডু নেহাতই এক প্রতীক। শালির। সেই ইঙ্গিত অন্য একটা সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

ওর কাছে তো সবচে' আপন ভায়রা,
তার আঙিনায় ও যে সুখের পায়রা। (হিন্দির[৮৬৩] অংশ)

অর্থাৎ এই ভায়রাটি নিছকই 'কান', এর ওপর টান বজায় রাখলে 'শালি' নাম্নী মাথাটা আসে।

একটা ক্ষেত্রে ভায়রাভাইদের সম্পর্কটা একটু জটিল হয়ে উঠতে পারে যদি ঘটনাটা এইরকম হয়—

জোড়া-ভায়রা বনে গেছে ওই ভায়েরা,
সম্পর্কে বোন হয় যে জায়েরা। (হিন্দি[৮৬৪])

এর মধ্যে আঁশটে গন্ধ খোঁজাটা হয়তো অন্যায়, কিন্তু একশো ভাগ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কী? কিছু ভাশুর-দেওরের কীর্তির কথা আমরা আগে যা শুনেছি তা না হয় ভুলেই যাচ্ছি, কিন্তু এখানে যে ভ্রাতৃজায়ারা একই অঙ্গে শ্যালিকাও।

প্রবাদের শালিদের মোহিনী শক্তি এতই প্রবল যে ওরা যেখানেই থাকে ভগ্নীপতিদের চোখে জায়গাটা তীর্থ হয়ে ওঠে। যেমন কুমারী শালিদের দৌলতে শ্বশুরবাড়িটা।

চাঁদ বিহনে আকাশ যেমন
লাগে খালি খালি,
শ্বশুরবাড়ি ফাঁকা লাগে
না থাকলে শালি। (সিন্ধির[৮৬৫] অংশ)

তার মানে এ নয় যে শালি থাকলে জামাইবাবু তার সঙ্গে চাঁদ-তারা নিয়ে উড়ু উড়ু কথা বলে। কথা যা-কিছু হয় তা হাসি-ঠাট্টারই ছদ্মবেশে। তারই মধ্যে যা বলার থাকে চোরা পথে চালাচালি হয়ে যায়। তা, রসিকতার শক্তি কম নাকি?

ভোজটা জমে টাটকা 'ফলি' মাছে,
ঠাট্টা জমে থাকলে শালি কাছে। (ওড়িয়া[৮৬])

ঠাট্টা ক'রে মন কি ভরে
শ্যালিকা না থাকলে ঘরে? (ওড়িয়া[৮৭])

তা, কী ধরনের রস-রসিকতা চলে?

সে তো অনেক কিছুই, এমনকী আদিরস ঘেঁষাও। তবে গড়পড়তা জামাইবাবুর রসিকতা খুব একটা দুঃসাহসিক হয় না।

হয়তো একটু আধটু রূপবন্দনা।

আহা আমার শালি
যেন ফুলের ডালি। (হিন্দি[৮৮])

দু-একটা অর্ধসত্য।

মনে পড়লেই বুকটা আমার
করে যেন হু-হু,
কালকে তুমি বলবে কাকে
"শ্যাম-সমান তুঁহু!" (হিন্দি[৮৯])

চাঁদপানা ওই মুখটা দেখে
আপশোশ হয় খালি,
আগে তোমার দেখা পেলে
দিদিই হত শালি। (হিন্দি[৯০])

ও শ্যালিকা, সেদিন ছিলে নেহাত বালিকা,
নইলে তুমিই দিতে আমায় বরণমালিকা। (হিন্দি[৯১])

তবে শালি বললেই আমাদের চোখে যে এক মাধুর্যমণ্ডিত রূপ ফুটে ওঠে বাস্তবে তেমন আর কটা হয়। সাদামাঠাদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আবার সেটুকু সুখও সবার কপালে নাও থাকতে পারে। এমন খবরও পাওয়া যায়—

শ্বশুরবাড়ি দুদিন থেকেই
জামাই এল পালিয়ে,
তেড়িয়া-খেঁকি-বদমেজাজি
কেমনতরো শালি এ! (হিন্দি[৯২])

অবশ্য এখানে একটা অন্য সন্দেহও উঁকি মারে। এমন তো নয় যে, জামাইবাবুটি কিঞ্চিৎ রসচর্চা করতে গিয়েই ঠোকর খেয়ে এসেছে? কেননা এমন শালিও হয় যারা নিজেদের ফাউ ভাবতে দিতে রাজি নয়, দিদির চৌহদ্দিতে থাবা মারতেও তাদের রুচিতে বাধে। রীতিমতো তেজ দেখিয়ে তারা বলে—"দিদি আমার বলে কি তার বরও আমার হবে (কন্নড়[৯৩])?"

আবার এমন শালিও হয় যারা জামাইবাবুর ফস্টিনস্টিটা বেশ উপভোগই করে। এমনকী আড়ালে বলা একটু আধটু প্রেমের কথাও। যেমন—

'জামাইবাবু' বোলো আমায়
আর যেখানে চাও,
বেগুন-খেতে এসে এখন
একটু ক্ষ্যামা দাও। (কন্নড়[৮৭৪], তুলনীয় তেলুগু[৮৭৫])

প্রকাশ্যে যেসব রসরসিকতা চলে তাতে সাধারণত বউরা বিশেষ ভাবিত হয় না। বড়ো জোর ওদের কপালে দু-একটা ভাঁজ পড়ে, কিংবা বিড়বিড় করে ওরা হয়তো বলে—

সাতসকালে শালির সঙ্গে
ঠাট্টা কিছুটা সয়,
গা-ধোয়া আর পান্তায় যদি
ঠান্ডা দেহটা হয়। (ওড়িয়া[৮৭৬])

কিন্তু একবার যদি বউ টের পায় রস সত্যিসত্যিই জমে উঠেছে, পবিস্থিতিটা সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে বউ যদি বরের হাবভাব থেকে বুঝতে পারে—

বউ হয়েছে চোখের বালি,
চোখের মণি ওনার শালি। (হিন্দি[৮৭৭])

বউ জ্বলে পুড়ে মরছে দেখেও কিছু পুরুষ লীলাখেলা যেমন চলছে চালিয়ে যায়। বাড়িতে অশান্তির চরম হলেও, পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেলেও ওরা ক্ষান্ত হয় না। হয়তো বলে—

শালি, শালি, শালি!
তোমার জন্য সব সইব—
পড়লেও মুখে কালি। (হিন্দি[৮৭৮])

এতখানি বেপরোয়া মেয়ে-পাগল যারা হতে পারে তারা শালাজদের দিকেও হাত বাড়াবে না কেন? সারা ভারত শুধু এই কথাটাই জানে "সালী আধী ঘরওয়ালী", কিন্তু বাঙালিরা এটাও জানে যে, "শালি-শালাজ আধেক মাগ।" শুধু তা-ই নয়, অন্যত্র আবার শালাজদের আরও এক কাঠি এগিয়ে রেখে বলা হয়েছে—

শালিতে পাই আধেক মাগ,
শালাজে পাই পুরোটা ভাগ। (উর্দু[৮৭৯])

তফাতের কারণটা অনুমান করে নেওয়া যায়। বোধ হয় দিদিদের কাছ থেকে থাবা মেরে নিতে বাধো বাধো ঠেকে বলেই শালিদের পক্ষে 'পুরো' হয়ে ওঠা সহজ হয় না। অপর পক্ষে শালাজদের টার্গেট যেহেতু চিরশত্রু ননদদের পায়ের জমি, বিবেক-টিবেক হয়তো ওদের তেমন বিরক্ত করে না। ঠাকুরজামাই এলে ওরা যেমন নেচে উঠে বলতে পারে "এক মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে", তেমনিই গোপনে কাকুতি মিনতি করতে পারে, "ঠাকুরঝিকে যেমন-তেমন, আমায় ভালোবেসো।"[৮৮০]

তেমন রমণীমোহন পুরুষ হলে কেউ কেউ তো শালি শালাজ দুজনের সঙ্গেই চালিয়ে

যায়। যদিও এরা যা করে তা প্রবৃত্তিরই টানে, এদের একজনকে তার জন্য যে-যুক্তি দিতে দেখা যায় তাতে বেশ হিসেবিয়ানা আছে।

শালা-ভায়রারা কখনও আমার
আসে না তো কোনও কাজে,
তাইতো আমিও পুষিয়ে নিচ্ছি
ক্ষতিটা শালিতে-শালাজে। (হিন্দি[৮৮১])

এখানে অনুমান করে নেওয়া যায় যে শালা আর ভায়রার টিকি কোনও না কোনও ভাবে লোকটার কাছে বাঁধা আছে তাই তার মাশুল দিচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য শালা-ভায়রা কী করে এসব মেনে নেয়?

না, প্রবাদের জগৎ থেকে এমন কোনও খবর পাওয়া যায় না যে, কোনও শালা বা ভায়রা রুখে দাঁড়িয়েছে। বরং একজনকে তো বউয়ের প্রাপ্তিযোগ দেখে খুশিই হতে দেখা যায়।

ভাগ্যিস ছিল ভায়রা—
বোয়ের কপালে টায়রা। (হিন্দি[৮৮২])

ওদিকে রমণীজয়ী পুরুষগুলোর বউদের হাল বড়োই খারাপ হয়। এর ওপর লোকগুলো যদি শালি-শালাজের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে বউদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে তা হলে তো কথাই নেই। বউরা সর্বক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর বলে—

আমাকেই যত গালি-গালাজ,
দেবী যে ওনার শালি-শালাজ! (হিন্দি[৮৮৩])

এক সময় হয়তো এসব বউ এটাকে ওদের কপাল বলে জেনে উৎপাতগুলো সয়েই নেয়। কিন্তু মাথার ওপর একটা খাঁড়া ঝুলতেই থাকে। বিপদের সম্ভাবনা বেশি থাকে আইবুড়ো বোনেদের দিক থেকে। প্রবাদের জগতে এমন বোনেরও খবর পাওয়া যায় যারা আগে থাকতেই জামাইবাবুদের নিয়ে একটা ছক কষে রাখে।

পাত্র আদৌ না-ই যদি জোটে
আছে তো ভগ্নীপতি,
তরকারি পাতে না-ই যদি পড়ে
ডালে নেই কোনও ক্ষতি। (তেলুগু[৮৮৪])

এবং একদিন হয়তো সত্যিসত্যিই এমন হয়—

সবাই গেছিল তীর্থে—
শালি-বোনাইকে দেখাই গেল না ফিরতে। (তেলুগু[৮৮৫])

শালির মোহে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে এ যেমন এক শ্রেণির জামাইবাবুর এক চরম উদাহরণ, তেমনিই আবার আরেক শ্রেণির জামাইবাবুর দেখা পাওয়া যায় যারা শালিদের চূড়ান্ত নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে পারে। শালিরা যে কখনওই আপন হয় না এ সিদ্ধান্তে ওরা সহজেই আসতে পারে ওদের নানান হাবভাব দেখে। ঠিকই ওদের চোখে পড়ে আপনজনদের সঙ্গে ওদের তফাতটা। যেমন—

নিজের বোনটি কাঁদতে কাঁদতে
ফিরল শ্বশুরবাড়ি,
বোয়ের বোনটা হাসতে হাসতে
বাগিয়ে নতুন শাড়ি। (গুজরাতি[৮৬])

অবশ্য শালিদেরই বা দোষ কী, গোড়াতেই তো আমরা দেখেছি নাড়ির টানের সামনে খোদ বউদেরও খেলো হয়ে যেতে। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্বরে সায় দিয়েছে এই আপ্তবাক্যটিতে—

মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ট্যাক পানে।
(তামিল[১], হিন্দি[২,৩], অসমিয়া[৪],
তেলুগু[৫], মারাঠি[৬], অংশত গুজরাতি[৭] ও কাশ্মীরি[৮])

তা সত্ত্বেও সেইসব মানুষের কমতি নেই যাদের কাছে—

প্রথম তীর্থ শ্বশুর-শ্বশ্রূ,
দ্বিতীয় বধূর ভগ্নী,
জনক-জননী হল মধ্যম,
শ্রেষ্ঠ স্বয়ং পত্নী। (গুজরাতি[৮৭])

এরা যেমন এক শ্রেণির পুরুষের এক চরম উদাহরণ, অপর দিকে আছে আরেকটি শ্রেণির চরম উদাহরণ যারা বিবাহসূত্রে গড়ে ওঠা আনুষঙ্গিক সম্পর্কগুলোর প্রতি নেহাতই উদাসীন। এদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা দার্শনিকের দৃষ্টিতে ওইসব আত্মীয়কে মোটা দাগের আঁচড়ে চার ভাগে ভাগ করে ফেলেছে (হিন্দি[৮৮])। 'তাকন'—যারা সব সময়ই কিছু পাওয়ার আশায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তরকন'—যাদের জন্য যতই কর কিছুতেই মন ভরে না, কথায় কথায় গোসা করে। 'কোনপইস'—যারা কুটুমবাড়িতে এলে আর কাউকে তেমন পাত্তা না দিয়ে সটান নিজের রক্তের সম্পর্কটির কাছে চলে যায় গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করতে। এবং 'দঁতাচিআর'—যারা কথায় কথায় দন্ত বিকশিত ক'রে জনসংযোগ চালিয়ে যায়।

বলাই বাহুল্য, এমন ভূয়োদর্শীর চোখে যারা চারপাশটা দেখে তারা নানান ঝুটঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়েই চলে। তবে তাতে কি আর পার পাওয়া যায়? কোনও না কোনও দিক থেকে অশান্তি ঢুকে পড়বেই। ভারতের নানান প্রান্ত থেকে যেসব খবর আমরা পেলাম তাতে সুখের ভাগ আর কতটা? বেশিরভাগ নারী-পুরুষই যেন বলতে চাইছে—

ঘুরেছি মোটে সাতটা পাক,
তাই বলে এই কুম্ভীপাক! (হিন্দি[৮৯])

মূল প্রবাদের তালিকা

মূল প্রবাদগুলো এখানে বাংলা লিপিতে দেওয়া হলেও অসমিয়া ও ওড়িয়া বাদে সবকটি ভাষার ক্ষেত্রে অক্ষরগুলোকে দেবনাগরী বলে মনে করে সেইমতো উচ্চারণ করে পড়তে হবে এবং 'ৱ' অক্ষরটিকে অন্তস্থ ব (ডব্লিউ) হিসেবে ধরে নিতে হবে। এতে উচ্চারণে মূল ভাষার অনেকটা কাছাকাছি যাওয়া যাবে।

মোটা দাগের হরফের সংখ্যাগুলো সেইসব প্রবাদের জন্য যেগুলো প্রবাদের সংকলন থেকে নয়, অন্য কোনও উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(১) পেট্রবড় বয়িট্রে পার্প্পাড় পেণ্সাদি মডিয়ে পার্প্পাড়।

(২) জোরু টটোলে গঠড়ী, ঔর মাঁ টটোলে অঁতড়ী।

(৩) মাঈ নিহারে পোটরী, জোইয়া নিহারে মোটরী।

(৪) মাও চাই মুখল, ঘৈণী চাই হাতলৈ।

(৫) তল্লি কুডুপু চুচুনু, পেণ্ডলামু বীপুচুচুনু।

(৬) আঈ বঘতে পোটাকড়ে, আণি বায়কো বঘতে পাটীকড়ে।

(৭) বায়ডী জোয় লাৱতো, নে মা জোয় আৱতো।

(৮) অনুবুনে, জেনুবুনে, রানিহুন্দে মদনো।
থকিমুতে, লুসিমুতে, মাজিহুন্দে গোবরো।

(৯) মায় মরূন বাপ মাৱসা।

(১০) আঈ গেলী ম্হণজে বাপ পাহুণা।

(১১) অব্ৱ সত্ত মেলে অপ্প চিক্কপ্প।

(১২) পেট্র তায় শেত্তাল পেট্র অপ্পন্ শিট্রপ্পন্।

(১৩) *বউ ভাঙলে শরা গেল পাড়া পাড়া,*
গিন্নি ভাঙলে নাদা 'ও কিছু নয় দাদা'।

(১৪) মামিয়ার্ উডৈত্তাল মণ্কলম্, মরুমগড্ উডৈত্তাল পোন্কলম্।

(১৫) অত্তকোট্টিন কুণ্ড অড়ুগোটি কুণ্ড, কোডলু কোট্টিন—কুণ্ড কোত্তকুণ্ড।

(১৬) *অম্মায়ি উটচ্চতু মণ্চটিট, মরুমকড্ উটচ্চতু পোঙ্কটিট।*

(১৭) অত্তে ওডেদ পাত্রেগে বেলে ইল্ল।

(১৮) মাময়ারুম্ ওরু ৰাট্টুপ্ নাট্টুপ্ পেণ্।
(১৯) অত্তা ওকইণ্টি কোডলে।
(১৯*) এগুা বান কলিসিৰস্তে, কুক্কলকু নক্কলকু পেড়িড়্।
(২০) পত্তুক্কু মেলে ওরু পরৈয়নুক্কম্ তড়ুড়ৱেণুম্।
(২১) মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করল খেয়ে,
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে।
(২২) মেয়েমানুষের বাড় কলাগাছের বাড়।
(২৩) পোন্নু বড়ারতিয়া পীরকে বড়ারতিয়া।
(২৪) ধীউ ধণু বন্ধদড্ড ৰণু।
(২৫) কুর্ বডুনস্ তু চের্ পপ্নস্ ছু নু কেঁহ্ তি লগান্।
(২৬) ছোকরীনী জাত নে উকরডানী জাত বরাবর।
(২৭) উপৰর মুলগী হী বাপাচ্যা উরাৰরীল শেগডী।
(২৮) জাগে জেনা ঘরমাঁ সাপ, জাগে দীকরীওনো বাপ।
(২৯) ঝিঅ ঘরে রহিলে অড়ুআ, ঘিঅ ঘরে রহিলে কড়ুয়া।
(৩০) আপ-ঘর কী বাপ-ঘর।
(৩১) দীকরী তো সাসরে কে মসাণে শোভে।
(৩২) জা ধীএ রাৰী, না কোঈ জাৰী না কোঈ আৰী।
(৩৩) ঝিঅ মরণ, পিতা তিউণ, ন মিলে রুণ—আগে দুঃখ পছে সুখ।
(৩৪) জ্যাচে পদরী পাপ, ত্যালা পোরী হোতী আপোআপ।
(৩৫) বেটা মাঙ্গকে বার-বার বেটিয়াঁ পায়া সাত,
বেচনা পড়া ঘর-বার, বিগড় গঈ বাত।
(৩৬) ও নার সুলখণী জিস পহলে জাঈ লছমী।
(৩৭) এক বেটী লায়, দোসরী মিঠায়,
তেসরী হোল ত তীনোঁ বলায়।
(৩৮) নালাৱদু পেণ্ নাদাঙ্গি মুড়েক্কুম্ তিক্কু ইল্লে।
(৩৯) অঞ্জু পেণ পেট্রৱন আণ্টি।
(৪০) অঞ্জু পেণ পিরন্দাল্ অরসনুম আণ্ডিয়াবান্।
(৪১) বোহ পুত্রী কুল মেহণা, বোহ মীহ কণ ঘট।
(৪২) ফসল কো খা জাএ বাড়, বেটিয়াঁ করে ঘর উজাড়।
(৪৩) শেজীচ্যা ঘরী ভুমভুম বাজে, কন্নুবাসাঠী কপাল খাজে।

(৪৪) লৌঁড়ী কো লৌঁড়ী কহা রো দী,
বীবী কো লৌঁড়ী কহা হঁস দী।

(৪৫) দুসরে কা সেন্দুর দেখ অপনা লিলাট ফোড়ে।

(৪৬) ঘরাত ঘাল্যারি পিকনা, আঙ্গণ্ডি ব্হেল্যারি বিকনা।

(৪৭) জাহা খাইবু খাইথা বোহূ আসিবা জাএ
জাহা পিন্ধিবু পিন্ধিয়া ঝিঅ জিবা জাএ।

(৪৮) লেকে হোঈ তো খাবে, সূন য়েঈ তো ল্যাবে।

(৪৯) মাগী খা' লে খা, ঝি-পুত আইবার আগে খা।

(৫০) দেগো ভলো ন বাপরো, বেটী ভলী ন এক,
পৈণ্ডো ভলো না কোস রো সাহব রাখে টেক।

(৫১) তায় শেত্তাড় মগড় তিক্কট্রাড়

(৫২) সোতিক বেটী ওলক টোঁটী, বিকৈতী ত বিকৈতী ন ত সড়লে গঁহ্ন্তী।

(৫৩) অম্মান্ মরাড়ুক্কু মুরৈয়া?

(৫৪) মামনে মরেমাপ্পুড়ডে অব্বনপতি য়েন বিসারিক্কণুম্।

(৫৫) বহেন কহীনে বেসাডে, নে বায়ডী করীনে উঠাডে।

(৫৬) বহন বহন বোলে নে ভনিয়া কাড়ে ছে।

(৫৭) বনী কে সৌ সালে, বিগড়ী কা কোই জঁবাই নহীঁ বনতা।

(৫৭*) অক্কন মগড়ন্নু বিট্টরে পাপ, অঙ্গন মগড়ন্নু তন্দরে পাপ।

(৫৮) তঙ্গী মগড়া না কৈ হিড়িবেকু অন্তীনী;
অক্কা য়াকা উরিদেড় বেকু।

(৫৯) অক্কাড় উডৈমৈ অরিসি তঙ্গৈচ্চি উডৈমৈ তবিডা?

(৬০) ইড়েয়াড়ে বাডি মলৈয়ালম্ পোবোম,
মুত্তাড়ে বাডি মুট্টিক্ কোণ্ডু শারোম্।

(৬১) মগড়ে ওম্ কল্যাণত্তুক্কু সিদনমা কুডুত্তা,
ওম্বোদু তেম্নাইমরত্ত মরত্ত য়েন মগনক্কু বরদক্ষিণৈয়া কেটা, য়েন্ন তপ্পু?

(৬২) কোরি কোরি বাবনু পোতে কুণিবাড়ু পুট্টাডট।

(৬৩) এটি অবতল ইচ্চেকন্ন এট্লো পডেস্তে নয়ং।

(৬৪) মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।

(৬৫) যমে নিলেও নিয়া, জোঁবাই নিলেও নিয়া।

(৬৬) ঝিঅকু জোঁই নেলা গলা, জম নেলা গলা।

(৬৭) জোইঁ নেলে জে, বাঘে নেলে সে।

(৬৮) জানে কহাঁ বিটিয়া কো লে গয়া জমাঈ,
লুটকর জিন্দগী ভর কী কমাঈ।

(৬৯) গাঁ কনিআঁ শিঙ্ঘাণিনাকী।

(৬৯*) গাঁয়ের মেয়ে শিকনি-নাকি।

(৭০) কুমারী কন্যা তিলা শশুর ঘর র শশুর ঘরে।

(৭১) অণ্‌ণপ্পা গেরি ন্‌হাবঞ্চেং কুট্রপ্পা গেরি জেবচে মেড়প্লেকড়ে নিদবঞ্চেং।

(৭২) সন্ন্যাসি পেড়িড়কি জট্টু দশ্নর নুণ্ডি অরেবে।

(৭৩) অণ্‌ণাপৈলেং পীট সুব্বায় পৈলেং মীট।

(৭৪) পরহথ্‌থী বণজ, স্নেহী খেতী, বিন বেখে দেবে বেটী,
অনাজ পুরাণা দবে খেতী—এ চারে বেখে ডুব দে ছেতী।

(৭৫) পরহথ বণিত সাঝ কে খেতী বে বর দেখে ব্যাহে বেটী,
ঘরো কে জে বিগাড়ে থাতী ঈ চাঁরণ মিল পীটৈ ছাতী।

(৭৬) ঘর দেখ, বর দেখ, কাঁথ খোড়ি কুজ দেখ।

(৭৭) গোত্তিরম্ অরিন্দু পেণ কোড়ু, পাত্তিরম্ অরিন্দু পিচ্চৈ ইড়ু।

(৭৮) আড়ে নোক্কি পেণ্‌ণু কোটুক্কং, মরং নোক্কি কোটিয়িটণং।

(৭৯) ঐসে ঘর মেঁ বিটিয়া দো, লৌটকে না কল আয়ে বো।

(৮০) এক গোরী, বহাত্তর খোডী চোরী।

(৮১) একে গোরা গা, তায় পোয়ের মা।

(৮২) ছোট বড় জগ করব, সাব করব ভারী,
খানদান দেখকে সাদী করব গোর হোয় য়া কারী।

(৮৩) কুলকন্যা কি কালি? তীর্থ পাণি কি গোলি?

(৮৪) ঘরাত ঘাণ আণি বায়কো মাঝী গোরীপান।

(৮৫) এরে হোল ইরবেকু, করে হেগুতি ইরবেকু।

(৮৬) ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো,
বিয়ে করো কালো, তাই গেরস্তের ভালো।

(৮৭) অড়কুড়ুড় পেণ্‌ণু পণিয়্‌কাকা।

(৮৮) জোরু চিকনী, মিয়াঁ মজুর।

(৮৯) কালী বায়ল ধোব্বাচী, গোরী বায়ল জগাচী।

(৯০) ডোমডী বায়কো একাচী, গোরী বায়কো লোকাচী।

(৯১) সুন্দর জোরু জাএ ঔরোঁ কে পাস, পতিদেব খুদ হী করে উপবাস।

(৯২) মেলাম্ মিনুক্কিয়েক্ কোণ্ডবন্ কেট্টান্, মেট্টিলে পয়িরিট্টবন্ কেট্টান।

(৯৩) গুণ বিনা রূপ তে জল বিনা কূপ।

(৯৪) উভা তাল, পোতা শাল, রুঅ হেন্তাল, গণ্টি বেতাল,
ঘরণি চেতুআল, তেবেসে ঘর জাএ অপার কাল।

(৯৫) চষা ছড়িলে বরষে, মূলিআ ছড়িলে দিবসে, গেরস্ত ছড়িলে পুরুষে।

(৯৬) খালী ঘালী ঘোণ, তিলা শিনল ম্হণে কৌণ?

(৯৭) ঊঁচা জোয়ো বলদিয়ো, নীচা জোঈ নার;
একল পেটো বাণিয়ো, এ ত্রণে গর্দনমার।

(৯৮) রোতী রাণ্ড, নে হসতা হালো, এনো কদী ন বলে দাহড়ো।

(৯৯) রড়তী রাণ্ড, নে হঁসতা পুরুষনো বিশ্বাস ন করবো।

(১০০) অড়ুব গণ্ডসন্ন্ নণ্ডব হেঙ্গসন্ন্ নম্ব বাঁরদু।

(১০১) চিরিয়্কুন্ন পুরুষনেয়ুং করয়ুন্ন স্ত্রীয়েয়ুং বিশ্বসিয়্ক্করুতু।

(১০২) অড়ি নোডি হেণ্ণু তা, তড়ি নোডি দন তা।

(১০৩) খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

(১০৪) দাঁত দেখকে গায় কো বাঁধো দ্বার,
লাও দুল্হন দেখকে পরিবার।

(১০৫) কূল পড্ডুন চল্লি হাডকা, থলি পড্ডুন গাই হাডকা।

(১০৬) ঋষিমূলমু, নদীমূলমু, স্ত্রীমূলমু বিচারিঞ্চ রাদু।

(১০৭) তল্লিনিচূচি পিল্লনু, পাডিনিচূচি বর্রেনু তীসিকো বলেনু।

(১০৮) গাই গুণে ঘি, মা গুণে ঝি।
গাছ গুণে গোটা, বাপ গুণে বেটা।

(১০৯) .....দই কিনি তার মাঝোত খাল, কইনা আনি যার মাওটা ভাল।

(১১০) তাইয়ন্তে মণ্ডডু, নায়িয়ন্তে বাল।

(১১১) টিক বলধা ওলাই মাটি, মাক ভালেহে জীয়েক জাতি।

(১১২) ঠাম তেবী ঠীকরী, নে মা তেবী দীকরী।

(১১৩) ঘড়ে সরীখী ঠীকরী, মা সরীখী ডীকরী।

(১১৪) মায় তশী বেটী, গহূ তশী রোটী।

(১১৫) আত্তাড়েত্ তণ্ণীর তুরৈয়িল পার্ত্তাল্, মকড়ে বীট্টিল পড়ি বেণ্ডাম্।

(১১৬) তায়্ এড়ডি পায়ন্দাল মগডু এট্টু অডি পায়্বাড়ু।

(১১৭) কোটি সুড্‌ডু হেড়ি ওন্দু কন্যাদান মাডু।

(১১৮) অনুজত্তিয়ে কাণিচ্চু এট্টত্তিয়ে কেট্টিচ্চু।

(১১৯) কাট্টিল্ আনৈয়েক কাট্টি বীট্টিল্ পেণ্ণৈক্ কোড়ুক্কিরদা।

(১২০) জেতে ভাই সেতে ঘর, জেতে কনিআঁ সেতে বর।

(১২১) রাজানে গমী রাণী নে ছাণাঁ বীণতী আণী।

(১২২) রাজা মানৈ জকী রাণী, ঔর ভরৌ পাণী।

(১২৩) পুরখ সাঠা সো পাঠা, স্ত্রী বীসী সো খীসী।

(১২৪) লাঠি ধরে উঠে বুড়া লাঠি ধরে বসে,
নিকার কথা শুনলে বুড়ো মাকনা হাতি ছুটে।

(১২৫) জোবনিয়া তূঁ ভলাঁ হী জাজ্যে, তূঁ মত জাজ্যে টহরকা।

(১২৬) ম্হাতারা নবরা কুঙ্কবালা আধার।

(১২৭) পডক্যা ভিন্তীলা লিঁপ্ কিতী, ম্হাতারা নবরা জপ্ কিতী।

(১২৮) বুঢ়ঢো পরণে বালকী, অভণ বেসে রাজ,
বোজ উপাডে বলদিয়া, এ সউ পরণে কাজ।

(১২৯) বুঢ়াপা কী বিআহ পরোসিয়া লাগ।

(১৩০) গাঁর মুণ্ডঘর চোরকু, বুঢ়াকাল বিভা পরকু।

(১৩১) বয়সনবন সেৱেৱড়নীর কোণ্ডু বন্দিচাং সন্দোশ পটনম্ পক্কতু বীটকারন।

(১৩২) তন্দেয় মদুবেগে পঞ্জু হিডিয়ুব মগ।

(১৩৩) তায়্‌ক্কু মুত্তুত্ তগপ্পনুক্কু বিড়ক্কুপ্ পিডিক্কিরান্।

(১৩৪) ঢবাঁ খেতী ঢবাঁ ন্যাব, ঢবাঁ হবৈ বুঢ়েরো ব্যাঁব।

(১৩৫) টাবরিয়াঁ হী ঘর বসৈ তো বাবো বুঢলী ক্যুঁ লাবৈ!

(১৩৬) বর তিরিশা, কন্যা দশা।

(১৩৭) জাড়া গয়ে জড়াবর, জোবন গয়ে ভতার।

(১৩৮) নানী খসম করে, দোহ্‌তা চট্টী ভরে।

(১৩৯) নানী খসম করে, নবাসা চট্টী ভরে।

(১৪০) নানী খসম করৈ দোহীতো ডণ্ড ভরে।

(১৪১) মা আইবুড়ো, বেটি শ্বশুরবাড়িতে যায়।

(১৪২) সাসু কুমারী নে বহু পরণী।

(১৪৩) রাণ্ডী দীকরী নে ছিনাল মা।

(১৪৪) দীকরো পরণ্যো নে বাপ কুঁবারো।

(১৪৫) অগ অগ ম্হশী মলা (কোঠে) কা নেশী?

(১৪৬) রর রাজী শীখথী, ভিখারী রাজী ভীখথী।

(১৪৭) রিদাই তো লেগী বেটী রোতে রোতে,
আঁচল মেঁ সোনা-চাঁদী ঢোতে ঢোতে।

(১৪৮) কনের মা কাঁদে আর টাকার পুটলি বাঁধে।

(১৪৯) অবো গসে, ধীউ রসে।

(১৫০) গুজরাঞ্চী বেটী সোন্যাচী, পেটী।

(১৫১) দীকরী নে গায়, জ্যাঁ দোরে ত্যাঁ জায়।

(১৫২) অঠরা নখী খেটরে রাখী, রীস নখী ঘর রাখী।

(১৫৩) কন্যা জউঁ ইশাণরে চাউল পকাইছি ধরি কান্ধি সেইটিকি জিব।

(১৫৪) আডপিল্ল পেড়িড় অডুগুদোরকনি বারি অন্তং চুসেরে।

(১৫৫) সেতিহা কে সেনুর ভর গাঁব বিআহ্।

(১৫৬) বিআহ্ করে সুরুখী কে সেনুর লগায়।

(১৫৭) খৈর কী জূতী, খৈরাত কা নাডা, পঢ় দে মুল্লা, অকদ উধারা।

(১৫৮) অরত্তুট্টিল্ কল্যাণম্ অতিলল্পম্ রেটিক্কেট্ট।

(১৫৯) অরৈতুট্টিলে কল্যাণম্ অদিলে কোঞ্জম্ রাণরেডিক্কৈ।

(১৬০) রীন্দ, রীন্দরো ভাঈ, তীজো বামণ, চোথা নাঈ।

(১৬১) দুল্হা দুলহন মিল গয়ে ঝূটী পড়ী বরাত।

(১৬২) তীন টেঢ় বরিয়াত মেঁ।

(১৬৩) রিহীনীচা পাপড় রাকড়া!

(১৬৪) না ভেস সে, না বাতোঁ সে মানো,
সম্বন্ধী সে পালা পড়ে তো জানো।

(১৬৫) ঘর মেঁ আঈ জোরূ, টেঢ়ী পগড়ী সীধী হুঈ।

(১৬৬) জব ঘর আবে জোঈ তব টেঢ়ী পগড়ী সোধী হোঈ।

(১৬৭) ঠাআরু ন উঠে বর, তাকু ধরাধরি বিভাকর।

(১৬৮) অণায়াল্ ওরু পেণ্ণু রেন্টে।

(১৬৯) আজ মেরী মঙ্গনী, কল মেরা ব্যাহ্, পরসোঁ লৌড়িয়া কোঈ লেজা।

(১৭০) পিচ্চি কুদিরিতে গানি পেড়িড় কাদু,
পেড়িড় অগ্নিতে গানি পিচ্চি ক্দুরুদু।

(১৭১) জনানি রোস্ মরুদ জচ রোস হুশ্।

(১৭২) গোর পরণাবী আপে, পণ ঘর চলাবী আপে নহীঁ।

(১৭৩) তীন দগড়াত ত্রিভুবন আঠবতে।

(১৭৪) কল্যাণমাল কণকমাল কাণুম্নোর্ক্কু ইম্পমাল; কড়িয়ক্কুম্নোর্ক্কু তুম্পমালা।

(১৭৫) ডোঙ্গরাচে আবলে ব সাগরাচে মীঠ।

(১৭৬) সাস চুমায় লে গেলী, অগে মায় পতোহূ অপগে রঙ্।

(১৭৭) ধন্য সে প্রজাপতি, বরকু কন্যা ঘটাঘটি।

(১৭৮) অটুক্কড়প্পোণ্ণিনু অড়কুবেণো?

(১৭৯) কাম কী পক্কী হো ঔরত, সাজ-সিঙ্গার কী ক্যা জরূরত?

(১৮০) আবতী বহূ নে বেসতো রাজা, পহেলা রাখে শরম, পছী মূকে মাঝা।

(১৮১) কালী কয়াঁ হী ঠীকৈ অর গোরী কয়াঁ হী ঠীকৈ।

(১৮২) পুত্তন্ পেণ্ণু পুরপ্পুরং তুক্কুং।

(১৮৩) লোহাঁ, লকড়াঁ, চামড়াঁ, পহলী কিসা বখাণ? বহূ বছেরাঁ ডিকরাঁ নীবড়িয়াঁ পখাঁণ।

(১৮৪) দাতা কাল পরখিএ, ধেন ফগ্গণ মাহ্,
ঘর দী নার পরখিএ, জে ধন পল্লে নায়।

(১৮৫) লাডী পাডী নীবড়ে বখাণ।

(১৮৬) যাহা হাতরে খাই নাহিঁ সে বড় রাঁধুণী,
যাহা সাঙ্গে ঘর করি নাহিঁ সে বড় ঘরণী।

(১৮৭) এক তিডীক দে আণি ঘরচী ধনীণ হো।

(১৮৮) তনগোল্লদ হেণ্ডতি, মনেগল্লদ মাড়িগে।

(১৮৯) ইষ্টমিল্লাত্ত অচ্চি তোট্টতেল্লাং কুট্টম্।

(১৯০) দেখকে উসকী চন্দ্রমুখী হঁসী,
বিন সব্জী কে ভাএ রোটী বাসী।

(১৯১) বীবী নেক বখ্ত, দমড়ী কী ডাল তীন বখ্ত।

(১৯২) কহতে হৈঁ ভাঙ্গ খাকে কসম—
আঈ বেগম তো বকরে দে পশম।

(১৯৩) বায়কো মাঝী গুড়াচী ভেলী,
গোতাবড়্যাচী কটকট গেলী।

(১৯৪) হগবনী বায়কো নাগবনী সোয়রা।

(১৯৫) কলবন্ত পড়ৌচে মাগুন, আণি বায়ল পড়ৌচী হাগুন।

(১৯৬) চরী আহে, খরী আহে, পাঁইজে ঘোট খে বণী আহে।

(১৯৭) সাঈ দে মনভাণী, তে কাণী বী রাণী।

(১৯৮) রাজার রানি, কানার কানি।

(১৯৯) দিল লগা মেণ্ঢকী সে তো পদ্মিনী ক্যা চীজ্ হৈ।

(২০০) জার্ল্ ভোলিড়নি খে বি প্যার্য় আহিনি।

(২০১) জী আবড়ে বরা, তী আবড়ে ঘরা।

(২০২) জব পতি কা প্যার মিলে, প্যার করে সীলবট্টা ভী,
বিন প্যার কে মেহনত দেখকে করে বহী তো ঠট্টা ভী।

(২০৩) গণ্ড ওলৈসিদরে গুণ্ডুকল্লু ওলৈসিতু

(২০৩*) গণ্ডনিগে বেডবাদরে গুণ্ডকল্লিগ্ বেড।

(২০৪) কুডিতরে গণ্ড মাডিদরে মনে।

(২০৫) রাণী রাণী রেঁহট্যো উচক, গেরমাঁ কমোদনী গুণ আবী।

(২০৬) যেতিয়া আহে ভতর, তেতিয়া লয় যন্তর।

(২০৭) কৈ নিরৈন্দ পোন্ ইল্লা বিট্টালুম্ কণ নিরৈন্দ কণবন্ ইরক্কবেণ্ডুম্।

(২০৮) অডক্যাচা উস, নবরা-বায়কো খুষ।

(২০৯) মী অন্ মাঝা নবরা ইতরাঞ্চা নকো বারা।

(২১০) খাজিং না হায় খোংদুমদা কনাসু পামজদ্রে।

(২১১) ইনম্ ইনত্তিল্ চেরুম্ এরণ্ড বেড়্ড়তিল্ চেরুম্।

(২১২) বরসাত বর সাথ।

(২১৩) জোরূ খসম কী লড়াঈ দূধ কী মলাঈ।

(২১৪) বর কো সব্জী চার, অপনে লিএ মাঁড়।

(২১৪*) ঘরণী গঙ্গা, পেজ পিইকরি বাঞ্চিছু সঙ্গা।

(২১৫) অরকী কে ভতরা ভুইয়াঁ ধরী কি ভঁড়সরা।

(২১৬) বেঘরনী ঘর ভূত কা ডেরা।

(২১৭) বেঘরনী ঘর পাদত হৈ, হৈ ঘরনী ঘর গাজত হৈ।

(২১৮) অগে মাঝে বায়লে সর্ব তুলা বাহিলে।

(২১৯) তানু বলচিন্দি রম্ভ, তানু মুনিঙ্গিদি গঙ্গ।

(২২০) কোত্ত আবকায়, কোত্ত পেড়্ড়ামু রুচি।

(২২১) বহূ নবেলী ঔর গৌ দুধেলী।

(২২২) নঈ কুঁআরি নব ভীঁইঁ।

(২২৩) বরনা লাড় বে দিবস।

(২২৪) বেছুয়ার (মেয়েদের) ভাতার মরদ, মরদের ভাতার কড়ি।.....

(২২৫) ঔরত কা খসম মরদ, মরদ কা খসম রোজগার।

(২২৬) থুকনুঁ আয়পদ, নে থুকনো বরো।

(২২৭(ঘড়ীনী নবরাশ নহীঁ, নে পৈসানী পেদাস নহীঁ।

(২২৮) ঘটকেচী ফুরসত নাহী দমড়ীচী মিলকত নাহী।

(২২৯) মরনস্ নু স্বকুল তু মস্ কাস্নস্ নু ফুর্সথ্ তু হারি নু জিয়্।

(২৩০) দিসায়লা কাম নাহী আণি বসায়লা বেল নাহী।

(২৩১) ধণী রে ধণী মারা নিধণ ধণী, তুঁ বেঠা মনে চিন্তা ঘণী।

(২৩২) পৈসা/দাম করে কাম, জোরু করে সলাম।

(২৩২*) দাম করী কাম, বিবী করী সলাম।

(২৩৩) ভরী জবানী পইসো পল্লৈ, রাম চলাবৈ তো সীধো চল্লৈ।

(২৩৪) মোরে পিআ রসিআ হজার বীরা খাস,
আগা পীছা রিনিয়া নবাব অইসন জাস।

(২৩৫) মোরে সৈয়াঁ চিকনিয়াঁ, পচাস বিড়া খাএঁ,
আগে পীছে রিনিহা, দীবানা বনে জাএঁ।

(২৩৬) নবড়ে মাটীএ রাণ্ড শূরী।

(২৩৭) কাম হো বর কা হরাম, ফৌজ মেঁ জায় তো আরাম।

(২৩৭*) উব না মোগুড়ু, উড়্‌ড়ো উন্না ওকটে, দড়্‌ড়ো উন্না ওকটে।

(২৩৮) বহু বহু কয়েত মন হোইয় হরখী,
নূআ লকড়ী জোড়েত মন হোইত চরখী।

(২৩৯) ঘর কে উপর হৈ টুটী পত্রী, ঐসে পতি সে হৈ ভলী ছত্রী।

(২৪০) অকরব পিয়বা মরিও না জায়,
সূতে কে বেরিয়া চিত ফরিআয়।

(২৪১) আ রে ম্হারা ঘররা ধণী, জট্টো থোড়ী জুঁবা ঘণী।

(২৪২) সাঠে কোসে লাপসী সৌএ কোসে সীরো, নহীঁ ছোড়লো নণদল বাঈ রো বীরো।

(২৪৩) অয়্যকু ৱিদ্যা লেদু, অম্মকু গর্বম লেদু।

(২৪৪) ওদু কলিত হেঙ্গসিন কূড গণ্ডসু এগলার,
অড়ুগে কলিত গণ্ডসিন কূড হেঙ্গসু এগলারড়ু।

(২৪৫) সোক্কব মনে, লোটকুব গণ্ড, এরড়ু ওন্দে।

(২৪৬) ওল্লদ গণ্ডনিগে মোসরল্লি কল্লু।

(২৪৭) আলিনি বয়নি বানিকি ঈলকূরলো উপ্পু চালদু।

(২৪৮) নারডতীচে মীঠ অলণী।

(২৪৯) অত্তোতাঈরো মাণ্টী আবৈ দোপারৈরো দিয়ো জগাবৈ।

(২৫০) রূঠো ঘা এরণপর, নে ভূণ্ডো মাটী রাণ্ড পর।

(২৫১) কোণ্ডার মুনিয়ির কণ্ডাব মুনিবর।

(২৫২) মোগুড়ু মুণ্ডা অণ্টে মুষ্টিবাড়ু কূডা মুণ্ডা অণ্টাড়ু।

(২৫৩) জগড মেটলা বস্তুন্দি লিঙ্গময়য় অণ্টে বিচ্চং পেট্টবে বোচ্চুমুণ্ডা অন্নাডট!

(২৫৪) ঘরচ্যানে ম্হটলে ভাণ্ড, জনানে ম্হণাবে রাণ্ড।

(২৫৫) ইণ্টিবাক বেলু চুপিতে, বয়টিবাক কালু চূপুতাক।

(২৫৬) তায় তূট্রিনাল্ উর্ তূট্টুম্ কোণ্ডবন্ তূট্রিনাল্ কণ্ডবন্ তূট্টুবান্।

(২৫৭) তাডিচেট্টু নীড নীডকাদু, তণ্ডলুকুন্নবাণ্ মোণ্ডডুকাদু।

(২৫৮) সাপ ম্হণূ নয়ে বাপডা আণি নবরা ম্হনূ আপলা।

(২৫৯) মঞ্চমু মীদ উন্নত সেপু মগড়ু কিন্দিকি দিগিতে য়মুড়ু।

(২৬০) পহলে চূমে গাল কাটা।

(২৬১) ইণ্টি মোগুড়ু কুণ্টেন কাডৈতে, রঙ্কু রামেশ্বরম্ পোবালা?

(২৬২) রাম ভজো এ রাঁড়োঁ! খসমাঁনেঁ ক্যুঁ ভাঁড়ো?

(২৬৩) ওঙ্গিল্ অরিয়ুম্ উয়র কডলিন্ আড়ম্, পাঙ্গি অরিবাড়ু তন্ পত্তাবিন্ বলিমৈ।

(২৬৪) বায়কো করতা সুখ বাটে, পণ ধবলা ঘেতাঁ গাণ্ড ফাটে।

(২৬৫) বায়কো কেলী ম্হণজে আণা পাঠীস লাগতো।

(২৬৬) বায়কো অঘড়পঘড়, বাণ্যাচী চঙ্গড়।

(২৬৭) বহূ লালী, ধন ঘর খালী।

(২৬৮) ঘড়ী ঘড়ী রূঠে বীবী কান পকড়ে কৌন?

(২৬৯) এক ছৌনী কে আঁচল মেঁ নোন, ঘড়ী ঘড়ী রূঠে মনাবে কৌন?

(২৭০) লগ্ন পহেলাঁ চন্দ্রমুখী, লগ্ন পছী সূর্যমুখী, অনে হবে জ্বালামুখী।

(২৭১) বহনে নে বরসাদনে জশ নহীঁ।

(২৭২) কুরকুরা পীসে ঝরঝরা পোবৈ জিণরা মাটী রাত্যু রোবৈ।

(২৭৩) চন্দ্দিকুড়ু তিন্নম্মা মগডি আকলি ইরগদু।

(২৭৪) ঘরাত অসতীল তুরী তর সংসার করতীল পোরী।

(২৭৫) আনী না মানী, রান্ধ গে ব্রাহ্মণীনী রসমস।

(২৭৬) তীন বুলায়া তেরহ্ আয়া ভঈ রাম কী বাণী,
রাধোচেতন য়োঁ কহে 'ঠেল দাল মেঁ পানী।'

(২৭৭) পটেল কহে পটলাণীনে, সাম্ভল মারী বাণী,
ত্রণ বোলাব্যাঁ তের আব্যাঁ, দে দালমাঁ পাণী।

(২৭৮) আপুন বাঈ পোটারী, ঘোবার দোড়ে বটারী।

(২৭৯) আয়া জাল দা সক্কা, শটক মন পক্কা,
আয়া মরদ দা সক্কা, ধডম্ দেবে ধক্কা।

(২৮০) খেশিজন প্যঠকনি খেশি মরুদ্ সরগরদান্।

(২৮১) বাদল মেঁ দিন দীসৈ ফুড় দলৈ না পীসৈ।

(২৮২) বয়লিল সরিয়ান সময়ত্তিল সাপ্পাট্রে কোণ্ডুবরাদ পেণ্ডাট্টিয়িন
মীদু কুডিয়ানবনুম কোবমডেগিয়ান, সুরিয়নুম কোবমডেগিরদু।

(২৮৩) টেমসর ন আরে হাজরী, তো খেতী বঈ বাবরী।

(২৮৪) জিকড়ে গেলী বাঁঝ, তিকড়ে ঝালী সাঁজ।

(২৮৫) ঘর কী বীবী হাঁড়নী, ঘব কুত্তোঁ জোগা।

(২৮৬) লগ্নালা গেলী, আণি বারশালা আলী।

(২৮৭) পীরবৈ ভরোসৈ ঘাবলিয়ো হী বাড়য়ো।

(২৮৮) নহীঁ আবতী বহু নে তেড়াঁ ঘণা।

(২৮৯) বায়ডী পরণে সারা ঘরনী, লেবা সারো লাবো;
ধণী সামী আঁখো কাঢে, পছী করবো পস্তাবো।

(২৯০) সুবহ্-শাম গুসসা করে রাঁড়; কৈসে রোকে গালিয়োঁ কী বাঢ়!

(২৯১) যারে হস্তে শাখা সিন্দুর, তাকে করে ভোকোরা ইন্দুর।

(২৯২) খসলী পহাড় সঁ, রুসলী ভতার সঁ।

(২৯৩) চুম্মা দেনা ভী ন জানে কৈসী হৈ য়ে নার,
দাঢ়ী-মোছ পে করে বার, উন পে লগাএ লার।

(২৯৪) লাড় করো পিয়া তোরে পর পোটা পোছো তোরা মোছে পর।

(২৯৫) অঙ্গাবর আলী ঘোরপড় আতা করতো চরফড়।

(২৯৫*) তেড়ে ক্যাকলাস ঘাড়ে চাপানো।

(২৯৬) য়ার কা গুস্সা ভতার কে উপর।

(২৯৭) কণ্ডলু আর্চি স্ম ইণ্ডলার্চুনু।

(২৯৮) জণীন্দী ছুটী, পরণীন্দী মুঠী।

(২৯৯) কোড়ুব তনক অত্তে উরদড়ু, কোট্টমেলে অড়িয় উরিদ।

(৩০০) খিচড়ীনে চাখ্যে নহীঁ, নে দীকরীনে লাড়চ্যে নহীঁ।

(৩০১) কাব পোরী উন, মিলাল্যাচে গুণ।

(৩০২) সু-বাঁরী নষ্ট হয় মাঝে লয় বাট; সু-তিরি নষ্ট হয় নিতো বেহায় হাট;
সু-কাপোর নষ্ট হয় যদি লয় জাপত, সুপুত্র নষ্ট হয় নুসুধিলে বাপত।

(৩০৩) ধী কাণী, নূঁ হঁড়ণী, খূ দী বিঙ্গী লঠ, রম্ভে উত্তে খেতী, চারে চোঢ়চপট।

(৩০৪) নষ্ট হইল জমি খান, মোদ্দে হইল বাট
নষ্ট হইল গিরির বউ নিত্যে করে হাট।

(৩০৫) গীত নাশ জাএ বাটে, পাণি নাশ জাএে ফাটে, স্ত্রী নাশ জাএ হাটে।

(৩০৬) তিরিগি আডদি, তিরুগক মগাড়ু চেড়ুদুরু।

(৩০৭) মর্দু রুলে ত খুলে. রন রুলে ত চুলে।

(৩০৮) পরপ্পান্ পয়ির ইড়ন্দান্ অরক্কাঞ্জি পেণ্ণু ইড়ন্দান্

(৩০৯) অকেলবা গইল মৈদান ফিরে, লোক কহিল কি হেরায় গইলে।

(৩১০) দাল বগড়ী তেনো দাহড়ো বগড়্যো, অথার্ণুঁ বগড়্যুঁ তেনুঁ
ররস বগড়্যুঁ, নে বায়ডী বগড়ী তেনী জিন্দেগী বগড়ী।

(৩১১) মতিলেনম্মকু গতিলেনি মগড়ু।

(৩১২) হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে, পাড়াপড়শি জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

(৩১৩) মূরখ নারী নে নগারাঁ কুট্যাঞ্জ কামনা।

(৩১৪) কাগুল্যা বগর ফোব নহ্য় নী মারল্যা বগর ঘোর নহ্য়।

(৩১৫) পতি চাহে নাক রগড়ে পত্নী, পত্নী চাহে পতি লা দে নথনী।

(৩১৬) মিয়াঁ নাক কাটনে কো ফিরে, বীবী কহে নথ গড়া দো।

(৩১৭) ও ফিরে নত্থ কঢ়াণনুঁ, ও ফিরে নক বঢ়াণনুঁ।

(৩১৮) কিহত করিলো কি, ধান দোন দি পৈটো আনিলো, নিতো কিলায় সি।

(৩১৯) নবর্যানে মারলে আণি পাবসানে ভিজবিলে, য়াচী ফির্য়াদ কোণাকড়ে?

(৩২০) গণ্ড হোডেদরে মনে বিডবেড়, হাগল কায়ি কহি আদরে বিসাডবেড।

(৩২১) বো দিন কব আয়েগা, পতি না জব পীটেগা?

(৩২২) মার পিয়া মার তোহর হথবা দুখায় হমর স্নেথরী ন জায়।

(৩২৩) মার মিয়াঁ মার তেরী হথড়ী পিরায় মেরী আদত ন জায়।

(৩২৪) অপন মিয়া মারতা ত মারতা ভাত কে তর হালী দেবৈন্হ সে গুণ ত মানতা।

(৩২৫) মোগুডিমীদ কোপং পোদ্দুমুনিগে ররকে।

(৩২৬) গণ্ডু হেণ্ডির জগড় উণ্ডু মলগুব্ব তনক।

(৩২৭) ইরুম্পু পড়ুত্তিরিয়ক্কুম্পোড় কোল্লনুং কোল্লত্তিয়ুং ওন্নিয়ক্কুং।

(৩২৮) রন্না চঞ্চলহারীআঁ, চঞ্চল কম্ম করে;
দিন ডরন পরছবিআঁ, রাতী নদী তরেঁ।

(৩২৮*) কাকের ডাকে মূর্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়।

(৩২৯) মউগী মরদা কা ভীরী না জায় ত বাঁঝিন কহারে,
আ জায় ত তকলীফ উঠারে।

(৩৩০) পাম্পিনু তল্লু কোড়ড়ান্ বালু, পেণ্ণিনু তল্লু কোড়ড়ান্ নাক্কু।

(৩৩১) জেরো বীবীনো গুস্‌সো তেরো মিয়াঁনো ঠোসো।

(৩৩২) ভূমা ভলা জো বোলনা, নূআঁ ভলী জো চুপ।

(৩৩২*) মাঝা মার তুলা দিসলা, তিচা নখরা নাহীচ বঘিতলা।

(৩৩৩) পুদপ্ পেণ্ণে পুদুপ্ পেণ্ণে নেরুপ্পু এড়ুত্তুরা,
উনক্কুপ পিন্নালে ইরুক্কিরদু শেরপ্পু অডি।

(৩৩৩*) উঠতে লাত বইঠতে ঘূঁসা, কা কহীঁ দীদী রাতো মেঁ কাটেলা চুঁটা।

(৩৩৪) নূপী ফুবা হায়বসে মরিন য়াওদবগী খুদমনি অৱাবা পামদবা।

(৩৩৫) মানৈবীয় আডিকেরদু মুড়ড় তিঙ্গর মাদিরি।

(৩৩৬) কাপু করণং না পট্‌লয়িতে, এট্‌লাকোডতাবো কোট্টর মোগুড অন্নদট।

(৩৩৭) বীন্দ-বীন্দণী জোড়ে-তোড়ে, লে পঙ্গেরী মাথো ফৌড়ে।

(৩৩৮) উণ্ডু উট্টু মুণ্ডে গণ্ডনিগিত্তডু।

(৩৩৯) অপনা হারা ঔর মহরী কা মারা কৌন কহতা হৈ?

(৩৪০) রাজুনু চুচিন কণ্টিতো মোগুণ্ণি চুস্তে মোট্ট বুদ্ধয়িন্দি।

(৩৪১) মোগুণ্ণি কোটিট মোগসালকেক্কি এডচিন্দট।

(৩৪২) অন্তনু কোট্টি অট কেক্কিন্দি; মোগুণ্ণিকোট্টি মোগসালেক্কিন্দি।

(৩৪৩) একদিন রীবী মাঙ্গ্‌তী থী মেরে হী লিএ তো মন্নত।
আজ তো হমারী জানকে পীছে পড় গঈ ঔরত।

(৩৪৪) আধী হোতী পতিব্রতা, মগ ঝালী মুসলদেবতা।

(৩৪৫) পড় গয়া খল্লা, উড় গয়ী খেহ, ফূল ফড়ক-সী হো গয়ী দেহ।

(৩৪৬) মোগুডু কোট্টিনা কোট্টে মুক্কু চীমিডি বাগা বদিলিন্দি।

(৩৪৭) হুঁ মরূ, পণ তনে রাঁড় কৈবার ছোড়ুঁ।

(৩৪৮) মী মরেন, পণ তুলা রণ্ডকী করীন।

(৩৪৯) হুঁ মরাঁ, পণ তনে রণ্ডাউঁ।

(৩৫০) অকরব পিয়ৱা মরিও না জায় সূতে কে বেরিয়া চিত ফরিআয়।

(৩৫১) চিড়পিড়ে সুৱাগ বিচে রণ্ডাপৌ চোখো।

(৩৫২) রাঁড় হুঈরো ধোকো নহীঁ, সপনো তো সাচো করণো।

(৩৫৩) ঘইতা পছকে মরু, সউতুণী রাণ্ড হেউ।

(৩৫৪) সৱতি গণ্ড সায়লি অন্দরে মুণ্ডে আগুৱৱরু য়ারু?

(৩৫৫) উদবিড়ালি উদ খা, স্বামী রেখে সতিন খা।

(৩৫৬) সৌত জাএ সৌত কা নাড়া ন জাএ।

(৩৫৭) সতিন নেই সতিনের খেঁতা কাপড় আছে।

(৩৫৮) কল তক চন্দর জো থা, আজ ৱো বন গয়া পোছা।

(৩৫৯) সেজ কী মক্‌খী ভী বুরী।

(৩৬০) জে ওকরা গোড় মেঁ রূপ বা সে তোরা মুঁহ মেঁ না বা।

(৩৬১) পহিলীলা থূ থূ, দূসরীচা খাল্লা গূ।

(৩৬২) আগলীলা মিলেনা চোলকে,মাগলীলা উকরী বোলকে।

(৩৬৩) পহলী বায়ডীনা ভাঙ্গে হাড়, বীজী বায়ডীনে লড়াৱে লাড়।

(৩৬৪) কালচ পালখীত বসলে, আজ তিনে রস্ত্যাৱর আণলে।

(৩৬৫) জা জা রাণ্ড্ তূ ঘর সে ভাগ, তূ হৈ মেরা খোটা ভাগ।

(৩৬৬) আলুকাদু, অদি (নোসটি) ব্রালু।

(৩৬৭) একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর,
সতিন এল আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর।

(৩৬৮) তুঁ তো রাণ্ড নঠারী, নে তারী আমলী হেঠে পথারী।

(৩৬৯) কূর্ ছে তীর্ য়োত্ কশ কড়ুহাস্ তোত্ ৱাতি।

(৩৭০) জনানী মর্দদী জুত্তী নাল হণ্ড জান্দী হৈ।

(৩৭১) জনানু গয়ি রব্বরন্ হন্দ্ পুলুহোর্ অখ্ ত্রোৱ্ তু ব্যাখ্ ছুন্।

(৩৭২) মর্দ কা ক্যা হৈ? এক জূতী পহনী ঔর এক জূতী উতারী।

(৩৭৩) সোজা রথে যাব না ভাই উলটো রথে যাব,
দুই সতিনে যুক্তি করে কাঁঠাল কিনে খাব।

(৩৭৪) তিরিয়োকে বন্দৱনু হিরিয় হেণ্ডতি বেডিদ।

(৩৭৫) অসক্কা পরণী বিলারি ত মুঁস কহলে জে হোখ মোর বহুআরি।

(৩৭৬) ওস্যালী বিলাড়ী উন্দরনী লাভী।

(৩৭৭) চুড়ৈল সে নাতা তোড়ো, ৰরনা ইস ঘর কো ছোড়ো।

(৩৭৮) গৈরোঁ সে আশনাই? বীৰী কো তো আস নহীঁ।

(৩৭৯) মোণ্ডি মোগুডি পেড়িড় কেড়িড় অর্ধরাত্রিরেড় অড্ডগোড চাটুনুণ্ডি অর্ধরূপায়ি কট্ণং চদিবিঞ্চিন্দ।

(৩৮০) মেরী খাটিয়া পে তূনে নিকালে অরমান,
উসী খাটিয়া পে আজ তূ জায়েগী শমশান।

(৩৮১) মারুঁ সিন্দুর ছীনৰানে তূঁ আজে রমা ছে হোলী,
আজে নহীঁ তো কালে ভরাশে তারা পাপনী ঝোলী।

(৩৮২) সৱতীলা সুন্দর করী প্রসাধন, মী তর সুন্দর ৱিনাপ্রসাধন।

(৩৮৩) সৱত পাহুন শৃঙ্গার আণি শেজার পাহুন সংসার।

(৩৮৪) সোক্কণ দে সুকা দে সত টোড়ে খাদে।

(৩৮৫) সতিনের পেলে দুনো খাই, পেটের বিষে ঘুম নাই।

(৩৮৬) সৌত করে বুরাঈ, স্বর্গ ভী হুয়া দুখদাঈ।

(৩৮৭) সউতুণী থাউ, সউতুণী কঁটা ন থাউ।

(৩৮৮) সৌত ভলী সৌতেলা বুরা।

(৩৮৯) সতিনের ঘা সওয়া যায়, সতিন-কাঁটা চিবিয়ে খায়।

(৩৯০) সবত পুঅর সবু গুহ।

(৩৯১) মাজি হঞ্জু গয়ি স্বনু কোরি হঞ্জু গয়া ব্যসু।

(৩৯২) জম কু ভগবান সাত পুঅ দিঅন্তু, সউতুণী কু গোটাএ ন দিঅন্তু।

(৩৯৩) অবড়ম্লান্ত ইৱড় তন্দরে ইৱড়ু মডকেলি উগুড়ু।

(৩৯৪) মোদলিদ্দৱড়ে ৱাসি, এৱিৱসিদরে উণ্গোড়ু।

(৩৯৫) দো জোরূ কী কশতী, দরিয়া মেঁ বসতী।

(৩৯৬) দো জালী দা ৱনড়া, জিৱে দো কুত্তে ৱিচ সূর।

(৩৯৭) কোঈ খীঁচে লঙ্গ লগোটী, কোঈ খীঁচে মুছরিয়াঁ,
কোঠে চঢ় কে দী দুহাঈ, কোঈ মত করিয়ো দোজনিয়াঁ।

(৩৯৮) দো মছলিয়াঁ সাথ খাও, দাঢ়ী-আঁখ গঁৱাও।

(৩৯৯) দো রন্নাঁ দা মাণা দাঢ়ী খো দী তে অক্খোঁ কাণা।

(৪০০) ইরণ্ডু পেণ্ডাট্টিকারন ৱীট্টিল নেরুপ্পন?

(৪০১) ঘর মেঁ আগ ফৈলাএ বৈঠী হৈ দো সৌতন,
মৈঁ তো হুঁ ইস আস মেঁ, লগে চুলহে মেঁ অগন।

(৪০২) দো ববাঁরো বর চূল্হো ফূঁকে।

(৪০৩) তূট্যা ফূট্যা সান্ধে, বে বায়ডীএ বর হাথে রান্ধে।

(৪০৪) এক বউ যার তার পাতে ভাত, দু বউ যার তার গালে হাত।

(৪০৫) উপাদ্রিগে ইব্বর হেণ্ডদির এডকিল্ল বলকিল্ল।

(৪০৬) অখ্ জনানু ছয়্ দরলখ ব্যাখ্ জলালথ।

(৪০৭) ওন্নায়াল্ পোরা, রণ্টায়াল্ পোরা।

(৪০৮) ইব্বরু হেণ্ডিট কাট, ইরুলু তিগণেয় কাট।

(৪০৯) দো জরুকা খসম চৌসর কা পাসা।

(৪১০) দো খসম কী জোরু, চৌসর কী গোট।

(৪১১) অন্যস্নেহম্ মলবেড়্ড়ম্, ভরতৃস্নেহম্ নিলবেড়্ড়ম্।

(৪১২) অনকর সুনর মোরা পানী কে হিলোরা,
অপন কুবর মোকে লে কে সুতে কোরা।

(৪১৩) অনকর সুধর বর পানী কে হক্কোর,
অপনা কুবুজ বর সতুআ ভর কৌর।

(৪১৪) ঘরবালী জানে কি বর হৈ কমীনা,
ফিরভী না রহা জায় উসকে বিনা।

(৪১৫) তুঝে মাঝে জমেনা, তুঝ্যাবাচুন গমেনা।

(৪১৬) জাড়ী হোয় তো ভাবে নহীঁ নে জাড়ী বগর নীন্দ আবে নহীঁ।

(৪১৭) কাণী হোয় তো ভাবে নহীঁ, নে কাণী বগর নীন্দ আবে নহীঁ।

(৪১৮) ভাই ভাই কন্দল পরে পাই আশ, তিরুতারে কন্দল ঘরেই প্রবাস।

(৪১৯) অনুজবধূ, ভগিনী, সুত নারী, সুন য়ে সঠ কন্যা সমচারী।

(৪২০) সরু ভাঙ্গি শহুর দেখি মূরত কাপোর নলয়।

(৪২১) পুরুষাঞ্চা ডোলা আণি স্ত্রিয়াঞ্চা চালা।

(৪২২) খসম দেবর দোনোঁ এক সাস কে পুত, য়ে হুআ য়া বহ হ্যা।

(৪২৩) বল্লি পলিকিন্দনি বারপক্কলো চেন্নিদট।

(৪২৪) তম্মনম্মবনাদরু নাদিনি নম্মবড়ল্ল।

(৪২৫) মেয়্ত্তাল মৈত্তুনিয়ে মেয়্প্পেন্ ইল্লাবিহার পরদেশম্ পোবেন।

(৪২৬) ন মলী নারী এটলে বাবা সহেজে ব্রহ্মচারী।

(৪২৬*) টাট কী অঙ্গিয়া, মূঁজ কী তনী, দেখ মেরে দেবরা মৈঁ কৈসে বনী?

(৪২৭) উজডীআঁ ভরজাঈআঁ বলী জিনান্দে জেঠ।

(৪২৮) বণ্ডেক্কি সিবালাডুতু বাবগারু চুস্তারনি ভয়পড্ডট্‌লু।

(৪২৯) বডাই বারগারা অণ্টে এমি গুড্ডিকণ্টি মরদলা অন্নাডট।

(৪৩০) দো সাল মুলুক জা নহীঁ পায়া, পৈসোঁ কা থা কড়কা,
উসে তো অব জানা হী হোগা, হুআ জোরু কো লড়কা।

(৪৩১) ঘোড়া কে কোড়া, বৈল কে পৈনা,
ভলমানুস কে বাত, ঔরত কে নৈনা।

(৪৩২) পঞ্চবরতা কে না হোয় পর সোহ্দন সে জান বাচে তব নু।

(৪৩৩) মোগুডু বিডিচিনা মাম ব্বিডুবডু, মাম ব্বিডিচিনা দেবতার্চন ব্রাহ্মাডু ব্বিডবডু।

(৪৩৪) হিতাচে মামঞ্জী ঠেবলে ঘরী আণি চৌধী সুনা গরভার করী।

(৪৩৫) পডেয়াদু পডেত্ত মরুমগড়ে উম্নেপ পরেয়ন্ অরুক্ক্ কনাক্ কণ্ডেন্।

(৪৩৬) ভট পড়ে বোহ্ জমানা, নতনী কো ঘুরে নানা।

(৪৩৭) শাহু-বোবারীর মাজত এঘারহা পৈ,
কথমপি আছে শান্তি ধরমটা লৈ?

(৪৩৭*) য়দি স্যাত্ শীতলো বহ্নিশ্চন্দ্রমা দহনাত্মকঃ।
সুস্বাদঃ সাগরঃ স্ত্রীণাং তত্সতীত্বং প্রজায়তে।।

(৪৩৮) এক চঁদরমা নব লখ তারা, এক সতী নৈ নগ্গর সারা।

(৪৩৯) জোরু গোরু আপে জগিলে ভল।

(৪৪০) খেতী জোরূ জোর কে, জোর ঘটে ত ঔর কে।

(৪৪১) তিরিয়া তেগ তুরঙ্গ বো রইয়ত কে ঠট্‌ঠ,
য়হ সব নাহীঁ আপনা পরে পরাঈ হ্থ।

(৪৪২) গুর্ জনানু, তু শম্শের য়িম্ ত্রনুবয়্ ছি বেবফা।

(৪৪৩) তিরিয়া জাত কমান হৈ, জিত চাহে তিত তান।

(৪৪৪) অবসারিপোগবুম আশৈ ইরুক্কিরদু, অডিপ্পান এনরু পয়মুম্ ইরূক্কিরদু।

(৪৪৫) গহু ঘালাবা দাটণী, বায়কো ঘালাবী কাচণী।

(৪৪৬) মোগুডিকে মোগতনং উটে অগসালায়নতো অবসরমেমি।

(৪৪৭) জুলাহে কী জূতী, সিপাহী কী জোয়, ধরী ধরী পুরানী হোয়।

(৪৪৮) গাড়েকরী বসলা গাড়্যাবর ব বায়কো দিলী ভাড়্যাবর।

(৪৪৯) চোর কো পকড়িয়ে গাঁঠ সে, ছিনাল কো পকড়িয়ে খাট সে।

(৪৫০) ঔর সাঙ্গ সোরা, সতীআলো সাঙ্গ দোরো।

(৪৫১) ছিনাল বাঈ বঘতো রঙ্গরাব উড়্খতো,
সতী দর্শনানে হ্লকট পলুন জাতো।

(৪৫২) নার নে নিকালা দন্ত, মর্দ নে তাড়া অন্ত।

(৪৫৩) হঁসী বৈরী বৈয়র কী, খাঁসী বৈরী চোর কী।

(৪৫৪) মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে।

(৪৫৫) রাণ্ড রোবৈ, ক্বারী রোবৈ, সাথ লগী সতখসমী রোবৈ।

(৪৫৬) ছঁউড়ী ছিনার গহগস্তা, কহাঁ বজার কহাঁ রস্তা।

(৪৫৭) বিল্লী কে হৈঁ বিল্লে সাত, না হৈ নাতা চুলহে কে সাথ।

(৪৫৮) পোয়্য়ি উদলেনম্ম এড়ুমনুবুলু পোয়িন্দট।

(৪৫৯) সকালী সৌভাগ্যবতী, সন্ধ্যাকালী গঙ্গাভাগীরথী।

(৪৬০) জিস ঘর নারী ফূড়ী, ও ঘর জানো কূড়ী।

(৪৬১) ঘরমাঁ হোয় ছিনাল, ছাননো ঢগলো জাণ।

(৪৬২) ধনকোর বাঈনী ধন কমাঈ, নে এক দীকরীঁনাঁ সাত জমাঈ।

(৪৬৩) মাঝী মুলগী সব্বাঈ, গল্লোগল্লী জাবঈ।

(৪৬৪) নাঠী রাণ্ড সো গাম উজ্জড করে।

(৪৬৫) আরসন নম্বী, পুরুষণ কঈব্বীট্ট্যাড়াঁ।

(৪৬৬) কপড়ে ফাটলে, ফার দুবলা ঝালী,
বায়কো পুনহা নবর্‌্যাপাশী আলী।

(৪৬৭) হড়েয় গগুন পাদরে গতি।

(৪৬৮) পহিল্যা বরা তূচ বরা।

(৪৬৯) নাতরে জৱুঁ, নে কহে ব্বড়াববা চালো।

(৪৭০) বহু নাতরে জায় নে ধণী ব্বলাববা জায়।

(৪৭১) গামড়ানী রাণ্ড নাতরে জায়, নে গামড়ো বড়াববা জায়।

(৪৭২) বায়ডী নাতরে জায়, নে ধনী বড়াববা জায়।

(৪৭৩) ভূখা জোরূ বেচে, রাজা কহে "উধার লূঁ?"

(৪৭৪) ভূখা গয়া জোয় বেচনে, অধানা কহে "বন্ধক রক্‌খো।"

(৪৭৫) না পাতিব্রত্যং না মোদটি পেনিমিটিকি তেলুসু।

(৪৭৬) পতিভক্তি চূপিস্তানু মগডা, চেপ্পুলু তে নিপ্পুলু তোক্কুতানু।

(৪৭৬*) হরালেল্ল হাদর্‌বাডি রাত্রি গগুন তলেয়ল্লিয় হেনু তেগেদড়ত্তে।

(৪৭৭) ডাগ ঝালা জুনা আণি মলা পতিব্রতা ম্হণা।

(৪৭৮) তাড়ু তেচনু মুহূর্তমেন্দুকু?

(৪৭৯) সৈজে চুড়ো ফুটিয়ো 'র হলকা হুয়গ্যা হাথ;
বাঈ রা বন্ধণ কট্যা, ভলী করী রঘুনাথ।

(৪৮০) রিজালে কী জোরূ কী সদা তালাক।

(৪৮১) চাকলিবাডি ভার্য়কু মঙ্গলিবাডু বিডাকু লিচ্চিনট্লু।

(৪৮২) সতীচ্যা দারী নাহী বত্তী ব শিন্দড়ীচ্যা দারী ঝুলে হত্তী।

(৪৮২*) দারী, দেউলিয়া, করণজাতি, রাতিক ভিতরে আণন্তি হাতী।

(৪৮৩) বীবী পহনে কুছ ভী, রাণ্ড পহনে কুছ ভী।

(৪৮৪) পঞ্চবরতী কে ফটল গুদড়িয়া বেসবা পেন্হে সারী।

(৪৮৫) রাম নাম লে সো ধক্কা পাবে, চুতড় হিলাবে তো টকা পাবে।

(৪৮৬) সতী থী সেডাএ, লণ্ডী থী খাএ।

(৪৮৭) নিন্ন মগড়গিয়ূ ননগে য়েষ্টোন্দু দুর্দিনগড়ম্মা,
ইন্নদরু কডুহিসু নন্না য়মন বড়ীগে য়েলম্মা।

(৪৮৮) দুরবিদ্দ মগনিগূ হত্তিরবিদ্দ হেণ্ডতিগূ সরি বরলারদু।

(৪৮৯) সাসু নে বহু সকারী, নে বচমাঁ বোলে তে নকারী।

(৪৯০) জাহাকু সহে কনিআঁ শাশু, ক্ষীর উপরে খণ্ড বরপু।

(৪৯১) মামিয়ারুম্ শাগাড়ো মনক্কবলৈয়ুম্ তীরাদো?

(৪৯২) জবান সাসু মরে নহীঁ, নে বহুনো দহাডো বড়ে নহীঁ।

(৪৯৩) সো দহাডা সাসুনা, তো এক দহাডো বহুনো।

(৪৯৪) সসু জা সউ ভীঁহঁ ত নুঁহুঁ জো বি হিকিড়ো ভীঁহঁ।

(৪৯৫) সাসূসাঠী রড়ে সূন, বাঈ সুটলে মী কাচাতূন।

(৪৯৬) তিকড়ে সাসূ আচকে দেত হোতী, কান্দে কাপতানা সূন রড়ত হোতী।

(৪৯৭) অম্মায়ি চত্তিট্টু মরুমকডুটে করচ্চিল্।

(৪৯৮) হঙ্গু নু তু রঙ্গু নু জণ্ড জীছ্ হশায়্, দোদ্ ন তু দগ্ নু কবু য়িয়ম্ ওশায়্।

(৪৯৯) সাস কে মরনে পর বহূ অগর রোতী,
বে আঁসূ হোতে হীরে য়া মোতী।

(৫০০) শাশুড়ি মল সকালে, খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকেলে।

(৫০১) সাসূ মেলী উন্হাড়্যান্ত আসূ আলে পাবসাড়্যান্ত।

(৫০২) মামিয়ার শেত্ত আরাম্ মাদম্ মরুমগড়্ কণ্ণিল্ কণ্ণীর বন্দদাম্।

(৫০৩) অত্তে সত্ত আরু তিঙ্গড় মেলে সোসেকণ্ণল্লি নীরু বন্তু।

(৫০৪) পোর মুঈ সাসু, নে ওণ আব্যাঁ আঁসুঁ।

(৫০৫) মঙ্গলে ন খোলী জূরা, হাথ পসার নে পেন্হী চূরা।
মায় মরে তব খোলী জূরা, সাস মরে তব পেন্হী চূরা।

(৫০৬) সাসূ গেলী ঠীক ঝালে, তুপাচে গাডগে হাতী আলে।

(৫০৭) একলা ঘরের গিন্নি হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।

(৫০৮) সাসূ গেলী ঠীক ঝালে, ঘরদার হাতী আলে।

(৫০৯) সাসূ মুৰাঁ ৰাপড়াঁ, নে ঘর বার য়য়া আপণা।

(৫১০) আঈজী মরে নে সাল্লাঁ তরে,
ৰহুজীনা পেটমাঁ ভুসকা পড়ে কে রখে সাসূ পাছাঁ ফরে।

(৫১১) অত্তে ইল্লদৰড়ু ঐশ্বর্যৰন্তে, সোসে ইল্লদৰড়ু সৌভাগ্যৰন্তে য়ারু ইল্লদৰড়ু ৰারণৰন্তে।

(৫১২) লঙ্ড়ে-লূলে বর সে হমেঁ হৈ নহীঁ এতরাজ,
না হো অগর উস ঘর মেঁ মা-বাপ কা রাজ।

(৫১৩) অল্লাহ্ মিয়াঁ তুঁহিঁজো থোরো, মুড্সু ডি জাঁইমি ছোরো।

(৫১৪) সূন সাঙ্গে গোষ্ঠী সাসূ অঙ্গণ লোটী।

(৫১৫) সাস গঈ গাঁৱ, বহু কহে মৈঁ ক্যা ক্যা খাউঁ।

(৫১৬) পোলী! পোলী! নী ভোগ মেন্নড়্ড়ে অণ্টে মা অত্ত মালপল্লি নুঞ্চি ৰচ্চেদাকা অন্নদট।

(৫১৭) সাস মেরী ঘর নহীঁ, মুঝে কিসী কা ডর নহীঁ।

(৫১৮) মন্দির মেঁ সাস কী সিবরাত,
বহূ কহে 'জয় জয় ভোলেনাথ!'

(৫১৮*) সাসু গঈ সৱরাত, নে ৰহুনে আৰী নৱরাত।

(৫১৯) হে ভোলেনাথ! সাসুণুঁ রহে তমারামাঁ ধ্যান,
অমনে মলে ভরপেট ধান।

(৫২০) আকলি এত্তুতোন্দি অত্তগারু অণ্টে, রোকলি ভিঙ্গৰে কোডলা অন্নদট।

(৫২১) নূ দা খাদা তে কট্টি দা লেআ বিরথা নহীঁ জান্দা।

(৫২২) সাস কা ওঢ়না, বহূ কা বিছৌনা।

(৫২৩) টাঢ ৰাগে সউনে, নহীঁ ৰাগে ৰহুনে।

(৫২৪) এক হী সাড়ী ঘর মেঁ হো তো সাস হী উসকো পহনতী হৈ।
লাচার বহূ তো নঙ্গী রহকর অপনে হী ঘর মেঁ বন্দী হৈ।

(৫২৫) সাসু নে ৰহুনী এক সাড়ী, সাসু পেহরে নে ৰহু উঘাড়ী।

(৫২৬) অধিক সূন পাহুণ্যাপুঢ়ে।

(৫২৭) ন রুচ্চী মূঁহা কঢ দীণ্ডী নূঁহা।

(৫২৮) নিগাইতির গাই হোইছি, লাগ্ লাগ্ খুআএ কুণ্ডা,
নিবোহুতির বোহু হোইছি, গালকু মারইনিতি খুন্দা।

(৫২৯) অত্তে মনেয়্ অত্তলে, আলে মনেয়্ অত্তলে।

(৫৩০) বহূ সে কাম করাও ডটকর,
গলতী নিকালো, মারো থপ্পড়।

(৫৩১) বার‍্যানে বাড়তো, থুঁকীনে ভিজতো।

(৫৩২) নাজুক নার তিলা চাবকাচা মার।

(৫৩৩) বাঈ মাঝী ডোম্বাড়ী, আণি অরসে পুনরে ওম্বাড়ী।

(৫৩৪) বহু চালে, নে ঘের হালে।

(৫৩৫) লুলী ঝাড়ু দৈ জদ এক টাঙ্ পকড়নাড়ৌ চাহীজৈ।

(৫৩৬) পাঙ্গলো পাণী সীপরা নিকল্যো, নে পন্ধর জণা পগ ঝালে।

(৫৩৭) বড়ী বহূ কো বুলাব জো খীর মেঁ নোন ডালে।

(৫৩৮) ঘী সুধারৈ সাগনে নাঁব বহুরো হোয়।

(৫৩৯) ঘিয়ো বনাবে তোরিয়াঁ, বড্ডী বহূ দা নাম।

(৫৪০) ছাসমাঁ মাখন জায় নে বহু ফুবড কহেবায়।

(৫৪১) বহুনাঁ লক্ষণ বারণামাথী জণায়।

(৫৪২) বহুরা লখণ বারণৈসূঁ ওড়খীজৈ।

(৫৪৩) কাপুরঁ চেসে কড় কালু তোক্কেটপ্পুড়ু কনবডুতুন্দি।

(৫৪৪) মামিয়ার উডে কুলৈন্দাল্ বায়ালুম্ শোল্লক্কুডাদু কৈয়ালুম কাট্টক্ কূডাদু।

(৫৪৫) সাসুনাঁ পগনে ঠেস লাগে তোবী বহুএজ পগে লাগবুঁ।
বহুনাঁ পগনে ঠেস লাগে তোবী বহুএজ পগে লাগবুঁ।

(৫৪৬) অত্তেগে অগসগেরি, সোসেগে বসবগেরি।

(৫৪৭) অত্তে কত্তেগে হোদরু চিত্তেয়িল্ল, সোসে তলে বগিলিগে বন্দরু হোয়িতু।

(৫৪৮) কোডলিকি বুদ্ধিচেপ্পি, অত্ত তেডু নাক্কিদটা।

(৫৪৯) সাসু জায় গোবাল্যাসাথে, নে বহুনে শিখামণ দে।

(৫৫০) সারা গাঁব তো জানতা হৈ কি পতি হৈ উসকে আঠ,
ফির ভী পঢ়া রহী হৈ সাস বহূ কো ধরম কা পাঠ।

(৫৫১) বিত্তেয়ডি মামি বিক্কুদডি গণিগারম্।

(৫৫২) অমর্চিন দাণ্ট্লো অত্তগারু বেল্লু পেট্টিন্দট।

(৫৫৩) খরো কোটা বউ চালতা, মাটো কোটা বউ লাউ;
তুমি কোটো বউ চালতা, আমি কুটি বউ লাউ।

(৫৫৪) উঠ্ঠ নী নূঁহেঁ নিস্‌সল হো, চর্খা ছড্ড তে চক্কী ঝোও।

(৫৫৫) আ নী ধিয়ে নিস্‌সল হো , চর্খা ছড় কে চক্কী ঝোও।

(৫৫৬) উঠ বহু, বিসামো খা, হুঁ কাঁতুঁ তুঁ দলবা জা।

(৫৫৭) উঠ বহুরিয়া সাঁস ল ঢেঁকী ছোড় জাঁত ল।

(৫৫৮) বহূ এ বহূ, ঘর থারো হৈ, ঢক্যোড়ো মতী উঘাড়য়ৈ।

(৫৫৯) কোঠীকঠলে কো হাথ ন লগানা, ঘরবার আপকা হী হৈ।

(৫৬০) দেবিয়োঁ কী তো ছবি হৈঁ চারোঁ ওর,
জিস দিশা মেঁ টাঙ্গ্ রখূঁ সাস মচায়ে শোর।

(৫৬১) হোঁঠ হিলে ন জিভিয়া খোলী, ফির ভী সাস কহে বড়-বোটী।

(৫৬২) অত্তেগে ওন্দু মাতু সোপেগে প্রাণসঙ্কট।

(৫৬৩) গাঁ পরিগুণ ধোবাতুঠরু দিশে, বন্ধু পরিগুণ অধবাটরু হসে,
ভারিজা পরিগুণ নিতি প্রতি ঘষে, বোহূ পরিগুণ নিতি পরষে,
শাশু পরিগুণ পাচরে বসে, পুঅ পরিগুণ বাপকু পোষে।

(৫৬৪) সূদি কোংস সোদেকু পোতে পাত রক্কলু বয়ট পড্ডায়ি।

(৫৬৫) সাস ভী কভী বহূ থী।

(৫৬৬) মাহেরচী পেজ আণি সর্বাঙ্গাস তেজ।

(৫৬৭) সাসরী জাতা কুচকুচ কাটে, মাহেরী য়েতা হরীখ বাটে।

(৫৬৮) সৌ গয়াঁ সগেবগে, বহু রহ্যাঁ উভে পগে।

(৫৬৯) অচ্ছা হৈ কি মায়কে হৈ পাস, পর হৈ ডর বুলা না লে সাস।

(৫৭০) উম্মুরলা পোরন্দবীড় ইরুন্দা পুগুন্দ বীট্রক্কুম্,
পোরন্দ বীট্রক্কুম্ আলৈয়রা তিগুটম্।

(৫৭১) সাসরুঁ ছেটে সারুঁ, নে মোসাড় টুঁকড়ুঁ সারুঁ।

(৫৭২) যেবে পাইথাএ ধইতা বুকু সজ হেউয়াএ বাপ ঘরকু।

(৫৭৩) বাপ সসুর মেঁ তানা, বন্দ হুআ মায়কে জানা।

(৫৭৪) মাঁ মরী, বাপ মরা, রাণী বনে কৌন জী? গৈর কী বেটী ভৌজী।

(৫৭৫) হিঙ্গজিরা পুঢ়ে কোম্বিবিরীচা কায় বাস?
তরণীতাঠী সাসুবাঈ, সুনেচা হোতো ত্রাস।

(৫৭৬) লহানপণী আঈ আঈ। থোরপণী বায়লাবাঈ।

(৫৭৭) বহূরাণী, তুম চাবল সে অলগ কর লো দাল,
মৈঁ জিমাউঁ বেটে কো, দে দো মুঝকো থাল।

(৫৭৮) দিবা দিবঠণী আণি বাঈল হাস্তরুণী।

(৫৭৯) পেড্‌ড়াং বেল্লং মুক্ক তল্লি মট্টি গড্ড।

(৫৮০) পেণ্ডলামু বেল্লুমু তল্লি দয়্যমু।

(৫৮১) তল্লি বিষং, পেডলাং বেল্লুম।

(৫৮২) ছিলা খেলাই দিন গেল আজ বলে ডাহিন।

(৫৮৩) আঈচা কাল, বায়কোচা মবাল।

(৫৮৪) মায়ে বিয়োলে মাগে পেলে—কার ধন কার!

(৫৮৫) মগনু সত্তরু চিত্তিল্ল, সোসে মুণ্ডেয়াগরেকু।

(৫৮৬) মগন্ শেত্তালুম্ শাগট্রুম্ মকমগড্ কোট্রম্ অণ্ডগিনার পোদুম।

(৫৮৭) মকন্ চত্তিট্রেন্‌কিলুং মকমকড্রুটে দুঃখং কাণণং।

(৫৮৮) মকন্ মরিচ্চালুং বেণ্টিল্ল মকমকড্ বিধবয়াল্ মতি।

(৫৮৯) কোড়ুকু বাণ্ডবলে কোডলু মুণ্ডমুয়্যবলে।

(৫৯০) কী করবে পুতে, নিত্য সে তো কানভাঙানির কাছে যায় শুতে।

(৫৯১) কাতক কুতিয়া, মাহ বিলাঈ, চৈত মৈঁ চিড়িয়াঁ, সদা লুগাঈ।

(৫৯২) কাতিক পিল্লী মাঘ সিয়ারিন চইত চিরইয়াঁ সদা কহারিন।

(৫৯৩) কাতী কুত্তী, মাঘ বিলাঈ, ফাগণ মিনখ'র ব্যাঁব লুগাঈ।

(৫৯৪) জিকড়ে সুঈ তিকড়ে দোরা।

(৫৯৫) বহাঁ সূরজ ঢলে, দোনো খাটিয়া পে চলে।

(৫৯৬) দিন কো শর্ম, রাত কো বগল গর্ম।

(৫৯৭) অত্তে কলিসিদ্দে কেলস; গণ্ড কলিসিদ্দে হাদর।

(৫৯৮) মদুবেগে মোদলু নবিলু মদুবে নিশ্চয়বাদ মেলে সিংহ মদুবেয়াদ মেরে কুরি।

(৫৯৯) ম্বশ্ লয়ি নু হার্ তু খবর প্যঠ মারিতোস হোণ্ড্।

(৬০০) মক্কড়িল্লদবনিগে হেণ্ডতি মুদ্দু; হেণ্ডতিয়িল্ল দবনিগে তানে মুদ্দু।

(৬০১) পাইক হোই চরণ ফাটুআ, বলদ হোই চালই মঠুআ;
পুরুষ হোই মাইপি চাটুআ, কহে দনাই এ হট্ হটিয়া, গায়ক হোই তো কণ্ঠ মোটুআ।

(৬০২) বহূ নে সিখায়া উসে অ-আ, রোটী কো বোলে বো মালপুআ।

(৬০৩) দীকরানে আবী মুছ, মা বাপনে না পূছ।

(৬০৪) পরণাবতাঁ সাসু হরখায়া, পছী সাসু হড়কায়া।

(৬০৫) লক্ষ্মী সোচকে লাঈ থী বহূ, অনবন কী বাত কৈসে কহূঁ।

(৬০৬) বহূ আঈ গোদ মেঁ, লাড় গয়া হৌদ মেঁ।

(৬০৭) পহলে মেরী বহূ তো থী ভলী, শহরী পানী সে অচ্ছাঈ টলী।

(৬০৮) অত্ত লেনি কোডলু উত্তমু রালু, কোডলু লেনি অত্ত গুণবন্ত রালু।

(৬০৯) পোন্নালে মরুমমড়ানালুম্ মণ্ণালে ওরু মামি বেণ্ডুম্।

(৬১০) ঘরসারখা গুণ, সাসূ ত্শী সুন।

(৬১১) আণিক্কু ইণঙ্গিন পোন্নুম মামিক্কু ইণঙ্গিন পেণ্ণুম অরুমৈ।

(৬১২) অত্তমঞ্চী, বেমুল তীপু লেদু।

(৬১৩) সাসু কোঈনী সাকর নহীঁ, মা কোঈনী ডাকণ নহীঁ।

(৬১৪) হশ্ বনিনু কুর হশ্ বনিনু মাজ্।

(৬১৫) অম্ময়োট্টোক্কুমো অম্মায়িয়ম্।

(৬১৬) সাসু কোঈনী মা নহী, নে বহু কোঈনী থায় নহী।

(৬১৭) ক্যা সাসূজী চটকো মটকো, ক্যা পটকাও কূল্হা;
ডোলী পর সে জব উত্তরূঈী জুদা করূঈী চূল্হা।

(৬১৮) চক্কী তলে ঘর তেরা, নিকল সাস ঘর মেরা।

(৬১৯) বহুজীনা পগলাঁ এবাঁ কে ঘর আব্যা নে সাসূজী মুবা।

(৬২০) সাসু খাধী, সসরো খাধো, নে খাধো ঘের-জমাঈ;
বার গামনাঁ গধেড়াঁ খাধা তো বী নহীঁ ধরাঈ।

(৬২১) নইহর খইলী, সাসুর খইলী, ঠূঠ কইলী পীপর;
ঈহে কুলদীপা আব তারী হাথ কে লিহলে মূসর।

(৬২২) সক্খ্যা সাসূলা দিলী লাথ, চুলত-সাসূচা কাপলা কান,
তিথে মামে-সাসূ মাগতে মান।

(৬২৩) শাশুড়ি মারেন গুঁতা, বউ বেটি পেল ছুঁতা।

(৬২৪) সাস রুসলী কূটত, পতোহ রুসলী সূতল;
গেলী জগাবে ত দেলী দো মূসর।

(৬২৫) সুনেলা স্বাতন্ত্র্য মোকড়ে, ম্হাতারী পীঠ দড়ে।

(৬২৬) আঈজী ভরে উভী ওরী নে বহুজী খায় খীর পোড়ী।

(৬২৭) দূধ দোহনে উঠী নহীঁ সাস, কল খাঈ থী গায় কী লাত;
বহূ কহে "অরে দেখো সূরজ, সো রহী হৈ অব ভী লাট।

(৬২৮) সাস নে ডালা গরম কলছুল নঙ্গ বহূ কী গাঁড় মেঁ,
বহূ রোঈ তো বোলী সাস "নখরে দেখো রাঁড় কে।"

(৬২৯) অত্ত পেরু পেট্টি কৃতুরুনি কুম্পটলো বেসিন্দট্।

(৬৩০) আধী করতে সূন সূন, মগ করতে ফুণফুণ।

(৬৩১) সোরিআঁ দী মোঈ গাঁ কিস্‌সে না লিআ নাঁ।
পেকিআঁ দা মোয়া কুত্তা, ধী সারা সির খুথা।

(৬৩২) আঈ থী মানো কেঁচুআ, তোড়া ঘর বন বিছুআ।

(৬৩৩) আমন্ পরাইয়াঁ জাইয়াঁ নিখেডন সকিয়াঁ ভাইয়াঁ।

(৬৩৪) বেটে পে বহূ করে জাদু-টোনা, সাস কে ভাগ মেঁ সুখী হোনা?

(৬৩৫) বহূ কে গলে মেঁ চাঁদী, রহে সাস নঙ্গী আধী।

(৫৩৬) মামিয়ার কট্টরদো কন্দ তুণি, নাট্টু পোণূ পোডরদো তঙ্গ চঙ্গিলী।

(৬৩৭) মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার।

(৬৩৮) দীকরানে আবী দাঢ়ী নে মানে মেলী কাঢ়ী।

(৬৩৯) ঝিয়ের উড়ে তন মায় পায় না মন,
পুতের উড়ে দাড়ি ফিরে বাড়ি বাড়ি।

(৬৪০) বেটা বিয়োলাম বউকে দিলাম, ঝি বিয়োলাম জামাইকে দিলাম
আপনি হলাম বাঁদি, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি।

(৬৪১) নূহাঁ পুত্তা নূঁ লে গঈআঁ, ধীআনূঁ লে গএ হোর;
বুঢ়টী বুঢ্‌ঢা ইওঁ বৈঠে জিবেঁ সন উপ্পর চোর।

(৬৪২) জী তুলিলো জোবাইর বুকত, পো তুলিলো বোবারীর বুকত।

(৬৪৩) সাস পতোহ মেঁ ঝগরা ভেল, সূপ ডগরা বখরা ভেল।

(৬৪৪) দূর বাশ, খুশ বাশ।

(৬৪৫) সাসবহুনা কজিয়া তে খীচড়ীনে উভারো আবে ত্যাঁ সুধী।

(৬৪৬) সাসুও রানী বহুরীয়ো রানী, কবন ভরে কুওঁ সে পানী?

(৬৪৭) হুঁ হী রাণী তূ হী রাণী, কুণ ঘালে চুলহে মেঁ ছানী?

(৬৪৮) তূ ভী রানী মৈঁ ভী রানী, কৌন ভরে পনঘটপর পানী?

(৬৪৯) ভলে হী সাস দে হমেঁ গালী, গালিয়োঁ সে ভর মী তো হৈ ডালী।

(৬৫০) সস্‌সেনী বারাঁ তালণিএ নূ তেরাঁ তালণ আইআঁ।

(৬৫১) দীপ নুঙ্গো অত্তেগে দীবটিগে নুঙ্গো সোসে।

(৬৫২) বরুহজি ম্‌বগুরে পর্ নয়্ আসিহে, ৰশি নয়্ আসিহে হশ্।

(৬৫৩) কোড়ুম্ পাবি আনালুম্ কোণ্ড মামিয়ার রেণ্ডুম্।

(৬৫৪) পালৈ বোৱারী চাওঁ, ঘুরি ঘুরি মোলৈ হে পাওঁ।

(৬৫৫) কাণো কলশিয়ো, নে রাণ্ড্যো সসরো।

(৬৫৬) কেটা বরলার ন খন চোতাল।

(৬৫৭) সাস নে কহা বহূ সে—পল্লু মাথে পে লিও,
পল্লু উঠে জোবন সে, সসুর কহে—জিও জিও।

(৬৫৮) আম্বড়া সসরানী লাজ কোণ কাঢ়ে?

(৬৫৯) জহাঁ বহূ কা পীসনা, বহাঁ সসুর কী খাট।

(৬৬০) কুঠোড় খায়ী রে সুসরো বৈদ।

(৬৬১) বট্ট চাটু পুণ্ডু, বাৱগারি বৈদ্যম্।

(৬৬২) সসুর হো জব গম্ভীর পল্লু চঢ়ে বহূ কা সির।

(৬৬৩) ভাভোজী ভারমাঁ, তো বহু লাজমাঁ।

(৬৬৪) নফট সসরো, নির্লজ্জ বহূ আব রে সসরা কহাণী কহূঁ।

(৬৬৫) সুঘড় বলৈয়া সসুরা লে বৈল মাঙ্গ্ বহূ কে দে।

(৬৬৬) ডাকু-জৈসা পতি কা হো জো ভী কসুর,
ভরোসা তো হৈ মেরা দেবতা সা সসুর।

(৬৬৭) শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে, আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে।

(৬৬৮) সসুর কো ঔরভী দো রোটী থা খানা,
পংখা হিলাকে বহূ বোলী না-না না-না।

(৬৬৯) নথী মরতো কে নথী মাচড়ো খালী করতো।

(৬৭০) দেখো য়ম য়হাঁ হৈ সাস, মত জানা সসুর কে পাস।

(৬৭১) সাস মোরা মরো সসুর মোরা জীও, অচল রাজ বহুরিয়া কা হোখো।

(৬৭২) অত্ত মিত্তি এরালু কত্তি।

(৬৭৩) সাস সে ভেনী অলগা, ত ননদ মিলনী বখরা।

(৬৭৪) কাঁটা বুরা করীল কা ঔর বদলী কা ঘাম,
সৌকন বুরী হৈ চূন কী, ঔর সাঝে কা কাম।

(৬৭৫) কুনুয়্ টঙ্গ্ পোপ জান্ ফোত্ বরিথ্ খাম্ নয়্;
গরু অন্দরুচ্ স্বন্ জান্ গামু অন্দরুচ্ জাম্ নয়্;
স্বপরু সুঞ্জ্ ল্যাখ্ জান্ পিতুরি সুঞ্জ্ পাম্ নয়্।

(৬৭৬) নণন্দ আণি কড়ীচা আনন্দ।

(৬৭৭) ছোটী ননদ অঙ্গিয়া কা বন্দ, বড়ী ননদ বিজলী বসন্ত।

(৬৭৮) বড়ী ননদ ছোটী, তো সব সে খোটী।

(৬৭৯) ছোটী চুকী ননদী জহর কে পুড়িয়া।

(৬৮০) সাসূ নাহী ঘরী—নণন্দ জাচ করী।

(৬৮১) বেনি বোয় চন্দু জোয়।

(৬৮২) অণ্ণন উণ্ণাদদু এল্লাম্ মৈত্তুনিক্কু লাবন্।

(৬৮৩) ভাঈএ আপেলুঁ পেটীএ, নে ভোজাঈএ আপেলুঁ খুঁটীএ।

(৬৮৪) জাময় আসি গাম্ ততি প্যঠ্ লদি পাম্।

(৬৮৫) বারা কোসাবর নণন্দ বসে, তিচ্যা বাসানে দহী দূধ নাসে।

(৬৮৬) আঈ তো মিয়াঁ বহনা আপকী, না কোঈ তোহফা কিসী নবাব কী।

(৬৮৭) আকা গলয়াক ভাংগ্রাসরী ম্হূন ভয়িণী গলয়াক সুম্বাদোরী।

(৬৮৮) একীনে ঘাতলী সরী, ম্হণূন দুসরীনে ঘাতলী দোরী।

(৬৮৯) জিসসে খানা পকবাতী হৈ উসকী দেবরানী,
মায়কে আকে ভৌজী কো বো বোলে চাকরানী।

(৬৯০) বাহ্ সসুর নে কৈসা লায়া জমাঈ,
আয়া সুনকর নৌকরানী নহীঁ আঈ।

(৬৯১) নণন্দনী নণন্দ নাতরে জায়, নে মারে হৈয়ে হরখ নহীঁ মায়।

(৬৯২) মোগুডু কোট্টিনন্দুকু কাদু কানি তোডিকোডলু নব্বি নন্দুকু।

(৬৯৩) নণন্দুল্যাচ্যা কণন্দুল্যা জাচ্ নকো মলা,
তূ জাশীল পর ঘরা তর মাঝীচ গত য়েঈল তুলা।

(৬৯৪) —জাউবাঈ! জাউবাঈ! মলা মূড় আলে।
—জা পূস নণন্দেলা।

(৬৯৫) বড়কী ননদী হরমজাদী বড়ী, হরদম লেসে রহে ছুড়ী।

(৬৯৬) আড-বিড্ড অর্ধ মোগুডু।

(৬৯৭) ভৌজী কী বোলী জহর কী গোলী।

(৬৯৮) ভৌজী জব দে গালী, সমঝো বলা অব টলী।

(৬৯৯) নণন্দ খেড়ী, রহাটাচী ফড়ী।

(৭০০) ভাঈ ভলাঁ হী মর জ্যাবো, ভাভীরো বট নিকলনো জোয়ীজৈ।

(৭০১) আড বিড়ুম্মা! অন্ত্র পিশাচম্মা! বত্তে ইন্টিলোনিকি তীসিকেড়িড়, মত্তে কোরকল্লু পেট্টু।

(৭০২) ননদ হো পড়োসন, রোজ করে পরেশান।

(৭০৩) ননদী ঘর মেঁ আগী লাগল, কেও ন মিঝাবে হে।

(৭০৪) ননদ কে ঘর লগী অগন, গঈ বো ফৌরন লেকে বৈঙ্গন।

(৭০৫) আপলে বাঙ্গে ভাজায়লা জাল দুসর্যাচে ঘর।

(৭০৬) জাদব হো য়া ব্রাম্হন, ননদ-ভৌজী মেঁ অনবন।

(৭০৭) হে জো ভৌজী কী লাড়লী, মৌকে পে নথনী মাঙ্ লী।

(৭০৮) জা-জাউলি আপনাউলি ননদ মাগি পর,
শাশুড়ি মাগি গেলে পরে হব স্বতন্তর।

(৭০৯) উন্দরালা মাউ, বায়কোলা জাউ।

(৭১০) জাবা তেথেঁ দাবা, সবতী তেথেঁ হেবা।

(৭১১) জাবা জাবা উভা দাবা।

(৭১২) ডেরাণ্যুঁ তোড়জুঁ রেরাণ্যুঁ।

(৭১৩) ঘর কো কোরট বনা কে জেঠানী হম পে করে মুকদমা,
হম ভী বকীল কম নহীঁ হৈঁ, মচা হী দেঙ্গে হঙ্গামা।

(৭১৪) বেটী লাট সাব কী, পাএ লাড় সাস কী।

(৭১৫) বড়ো বউ বড়ো বাপের ঝি, তান্‌রে বা কইবাম কী?

(৭১৬) করেগা কৌন বিশ্বাস—বহূ কী চাপলুস সাস?

(৭১৭) গপ্পীঁ বাতীঁ মেঁ বড্ডী, করতূতী বড্ডী জেঠানী।

(৭১৮) মুঝকো কাটে বিছুআ জৈসে তুঝকো জৈসে খটমল,
মেরে পাস তূ রোনে আঈ—অব তূ খুদ হী সম্ভল।

(৭১৯) কিনী কিনী পর ডেরাণী অ ন ডিনী।

(৭২০) খুহি প্যো ডেরিপো, জঁহিঁ বিএগ্নয়ো ভেণি পো।

(৭২১) ডেরোটু লড়াএ, মোটলো অড়াএ।

(৭২২) তূ চাহ মেরী জাঈ কো, মৈঁ চাহূঁ তেরী খাট কে পাএ কো।

(৭২৩) মত কর সাস বুরাঈ, তেরে ভী আগে জাঈ।

(৭২৪) জাবই মাঝা ভলা, লেক বাঈল বুধ্যা ঝালা।

(৭২৫) ধীঅড়ী সো করি, জো ডিঠুই মাউ ঘরি,
নুঁহড়ী সো করি, জো ডিঠুই সসু ঘরি।

(৭২৬) পুটু পেটঅঁ নাঠী অখউঁ।

(৭২৭) ডাইন তো সব কো খায়, সির্ফ জমাঈ বক্স জায়।

(৭২৮) ডায়ন কো ভী দামাদ পিয়ারা।

(৭২৯) জমাঈনুঁ নাম সাস্তড়ী সাসু মসাণমাঁথী বেঠী।

(৭৩০) অল্লুডু অন্টে বঙ্করতাডে লেচি নুচুন্টুন্দি।

(৭৩১) সস্‌সূ বিনা ন সাররে, হল্দী বিনা ন মাস।

(৭৩২) জাৱঈ আলা মাঝা অন্‌ আয়া বায়াঁনো তুম্‌হী লাজা।

(৭৩৩) মেরা জমাঈ জৈসা কোঈ মুশকিল সে হী মিলে,
বো ভী কোঈ উসে অগর সোনে সে হী তৌলে।

(৭৩৪) জামাইয়ের লাগি পিটা বানাই, এসে খায় জামাইয়ের ভাই।

(৭৩৫) জাৱঈ নৱহে, জাৱয়াচা ভাউ, ফুকট রান্ডে নাসলেস গহু।

(৭৩৬) সালী ছোড় সাস্‌ সুঁ হী মসকরী?

(৭৩৭) ঘরাত নাহী মেহুনী ৱ সাসূচী রান্ডোলী।

(৭৩৮) ঘরী নাহী সালী, সাসূশী করে টৱালী।

(৭৩৯) কূননৈক্‌ কোত্তু কুড়প্পডি মামি কাণিক্কুপ্‌ পিড়্‌ড়ৈপের।

(৭৪০) জব তক বেটী ন হো সয়ানী, দে উধার সাস তেরী জৱানী।

(৭৪১) দুঃখের কথা কারে জানাই, মায়ের পুত নয় শাশুড়ির জামাই।

(৭৪২) ধূড়ি ভকুল্যো মাউ পিরীঁ, ধন ভকুল্যো জোই পিরীঁ, অচ্ছে কপিড়ে সসু পিরীঁ।

(৭৪৩) ঝিঅ মলে জোঁই কাহার গোত।

(৭৪৪) মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

(৭৪৫) ধী মরী, জমাঈ চোর।

(৭৪৬) জামাই ভালো না, পাঁচ ব্যঞ্জন ছাড়া খায় না।
ঝিও ভালো না, তিন ব্যঞ্জন ছাড়া রাঁধে না।

(৭৪৭) আপড ফেণী পাপড ফেণী সাশুগা,
মামাচ্যা ঘরী জাৱঈ আলা ভাশুগা।

(৭৪৮) সদা বক্রঃ সদা রুষ্টঃ সদা পূজামপেক্ষতে।
কন্যারাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ।

(৭৪৯) অডৱিলো আম্বোতৈ তিনালি, অত্ত ইন্ট্‌লো অল্লুডৈ তিনালি।

(৭৫০) পারেঁ মণ পারেঁ মাণী কণক জৱাঁইয়াঁ খাণী।

(৭৫১) ইৱনারে মগড় গণ্ড, ইৱনারে কুড়ুমিণ্ড।

(৭৫২) শাহুরে খুবায় বাহু জোকারি।

(৭৫৩) জমাঈ রহ্যো ভূখ্যো তো কোনো কূলো দূখ্যো?

(৭৫৪) জাৱঈ পাহুণা আলা ম্‌হণুন রেডা কা দুধ দেনার আহে?

(৭৫৫) পত্রাবলী আধী দ্রোণা, তো জাবঈ শাহণা।

(৭৫৬) ব্যাহ্যা জাবয়া তুপাচা পেলা আণি ঘরচা পাহুণা উপাশী মেলা।

(৭৫৭) অত্তকুলেক অটিকল্ নাকুত্ উন্টে, অম্মুড্ বচ্চি দীপাবলি পন্ডুগ অন্নাডট।

(৭৫৮) আডিক্কু অড়েক্কাদ মামিয়ারৈত্ তেডি ময়িরৈপ্ পিডিত্তু শেরুপ্পাল্ অডি।

(৭৫৯) মগন সঙ্গাড পাঠ, অড়িয়ন সঙ্গড উট।

(৭৬০) অড়িয়, মনে তোড়েয়।

(৭৬১) জাটা উবতা ডাটা।

(৭৬২) জাবয়াঙ্ক দিম্লেলেঁ, রেবেন্তু মুত্তিলেঁ সম।

(৭৬৩) নই বাঙ্ক কি জোইঁ বাঙ্ক।

(৭৬৪) জামুতুর্ গর্ পামুতুর্।

(৭৬৫) জমাঈ দশমো গ্রহ ছে; তে খাতো জায় নে খাসডাঁ মারতো জায়।

(৭৬৬) অড়িয় হুট্রি মাবগে কেড়ু।

(৭৬৭) তিলাচা ভাত নাহী, জাবঈ গোত নাহী, সূন মায় বহীণ নাহী।

(৭৬৮) নাঠী আহে কাঠী প্যো হর্দম চুভে।

(৭৬৯) জাবই ন্হালা রাফা পাণী প্যালা।

(৭৭০) নাঠাড় জাবঈ লেকীনে গোড় অন্ শিড়ী ভাকরী তাকানে গোড়।

(৭৭১) জিনি খে ডিন্যূঁ জায়ূঁ তিনি সাঁ কহিড়্যূঁ বাহ্যূঁ।

(৭৭২) কসাই সে কম নহীঁ হৈ মেরা বর,
সসুর কো চূসনে মেঁ ছোড়ে ন কসর।

(৭৭৩) সিয়ান তিরীর গিয়ান বুদ্ধি ভতরত লয় কথা সুধি।

(৭৭৪) ভৌজী কো দেতী হো সাড়ী পে সাড়ী,
হম কো ভী দে দো না ইক চন্দেরী।

(৭৭৫) কূর ছে খর্।

(৭৭৬) কঁবারী খাবে রোটীয়াঁ, বিআহী খাযে বোটীআঁ।

(৭৭৭) বিহাঈ বেটী পড়োসন দাখল।

(৭৭৮) মাজ করান্ 'কুরিকুরি', কূর্ করান 'রানি-রানি'।

(৭৭৯) মায়ে বলে 'ঝি-ঝি', ঝিয়ে বলে নাঙটি।

(৭৮০) মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে।

(৭৮১) মা মরে ঝিয়ের লেগে, ঝি মরে গদা নাঙের লেগে।

(৭৮২) জীয়েই যাওক বা জোঁবায়েই যাওক, পো-বোৱারীর মাথোন ঘরখন হওক।

(৭৮৩) অরুমৈ মরুমগন্ তলৈপোনালুম্ পোগট্টুম্, আদিকালত্তু উরল্ পোগল্ আগাদু।

(৭৮৪) নিন্না-মোন্না রচ্চিন অল্লুনি তল পগিলিনন্দুকু কাদু নাড়্ড় নাড়্ড় রোকলি ব্রিরিগিনন্দুকু এড্ডস্তুন্নানু।

(৭৮৫) জামাতা কৃষ্ণসর্পশ্চ পাবকো দুর্জনস্তথা।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ পঞ্চমো ভগিনীসুতঃ।

(৭৮৬) অত্তে ইক্কি অড়িয় দোড্ডোনাগলিল্ল।

(৭৮৭) দূর জমৈয়া আদ গিদ লগ জমৈয়া আধ,
ঘর-জমৈয়া গদ্হা বরোবর জব চাহে তব লাদ।

(৭৮৮) সাসরুঁ পিয়র পাসে বসে, তে নারী কান্ত নে হসে।

(৭৮৯) পাস কে জীজা কো বকরা কহে, দূর কে জীজা সে চিপকে রহে।

(৭৯০) দূর জমৈয়া আগত ভাগত, লিগ জমৈয়া ভেড়া।

(৭৯১) শ্বশুরগৃহনিবাসঃ স্বর্গতুল্যো নরাণাং।
য়দি ভবতি বিবেকী পঞ্চ বা ষড় দিনানি।।
দধিমধুঘৃতলোভান্মাসমেকং বসেচ্চে।
ভবতি বিগতলজ্জো মানবো মানহীন।।

(৭৯২) শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী, দিন পাঁচ-সাত আদর ভারী।

(৭৯৩) শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

(৭৯৪) সাসরো সুখবাসরো, দো দিনাঁরো আসরো,
তীজে দিন রৈবৈ তো খাবৈ খাঁসড়ো।

(৭৯৫) সসুরাল সুখ কী সার জো রহে দিন দো-চার।

(৭৯৬) ঘরজামাই আধা চাকর সর্বলোকে বলে;
বাপ-দাদার নাম নেই, ফলনার জামাই বলে।

(৭৯৭) 'ঘর-জামাঈ' হৈ ইসকা নাম, রোটী তোড়না এক হী কাম।

(৭৯৮) ঘরজমাঈ সে কহে সসুর—"কহাঁ ছুপা হৈ বুদ্ধু,
দূর-জমাঈ কো বোল্—খাও ঔর ভী লড্ডূ।"

(৭৯৯) যা ছিল আমানি পান্ত মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজমাঈ রামের তরে ধান শুকোতে দিনু।

(৮০০) জাহা ন খাইব ঝিঅ, তাহা জোঁই পতরে দিঅ।

(৮০১) ইল্লরিকপুটল্লুড্ডু ইণ্টিকি চেট্টু, কোম্মুলবর্রে কোট্টানিকি চেট্টু।

(৮০২) খেত্র বচ্চে রাঈ, নে বচ্চে ঘের আব্যো জমাঈ।

(৮০৩) কুতা ত কুতা শ্বশুর ঘরে জ্বাঈঁ।

(৮০৪) এক কুতা শ্বশুর ঘরে জ্বাঈঁ, এক কুতা ভণী ঘরে ভাঈ।

(৮০৫) পহিলা কুত্তা 'কুত্তা' বোলে, দুসরা কুত্তা ঘর-ঘর বোলে।
তিসরা কুত্তা জোরু কা ভাঈ, চৌথা কুত্তা ঘরজমাই।

(৮০৬) কুত্তা পালে রহ কুত্তা, মামা ঘর ভানজা কুত্তা,
বহন ঘর ভাঈ কুত্তা, সাসরে জামাঈ কুত্তা।
সব কুত্তোঁ কা রহ সরদার জো পৌঢ়া রহে জমাই-দ্বার।

(৮০৭) বহন কে ঘর ভাঈ কুত্তা, সাসরে জাঁবঈ কুত্তা, কুত্তা পালে রহ কুত্তা।
সব কুত্তোঁ কা রোহ সরদার জো বাপ রহে বেটী কে বার।

(৮০৮) সোরে ঘরজবাঈ কুত্তা, ভেণ দে ঘর ভাঈ কুত্তা;
সারে কুতিয়াঁ দা সরদার সোরা রহে জবাঈ নাল।

(৮০৯) লৌঁড়োঁ কী খুশামদ সে সসুরাল মেঁ বাস।

(৮১০) অম্মান্ বীট্টু রেড়াট্টিয়ে অডিক্ক অদিকারিয়েক্ কেক্ক রেণ্ডুমা?

(৮১১) উত্তমা আত্মনা খ্যাতাঃ পিত্রা খ্যাতাশ্চ মধ্যমাঃ।
মাতুলেনাধমাঃ খ্যাতাঃ শ্বশুরেণাধমাধমাঃ।

(৮১২) স্বনামা উত্তমা, পিতৃনামা মধ্যমা, শহুর নামা অধমা।

(৮১৩) গর্ প্যঠ্ জামুতর্ প্যঠ্ হূন্।

(৮১৪) তগপ্পনৈক্ কোন্র পারম্ মামিয়ার্ বীট্টিল্ আক মাসম্ ইরুন্দাল পোণ্ডম্।

(৮১৫) কানালা কোপর জডেনা সাসূ মেলী জাবঈ রডেনা।

(৮১৬) ভউণী ঘরে ভাই, শশুর ঘরে জোঈঁ, পর অইঁঠা খাই।

(৮১৭) দুর্মন্ত্রী রাজ্যনাশায় গ্রামনাশায় কুঞ্জরঃ।
শ্যালকো গৃহনাশায় সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ।

(৮১৮) মামা-শালা যে সংসারে সে সংসার যায় ছারেখারে।

(৮১৯) দীবার খাঈ আলোঁ নে, ঘর খায়া সালোঁ নে।

(৮২০) ভীঁতনৈ খাবৈ আলা, ঘরনৈ খাবৈ সালা।

(৮২১) কন্ধ খাদী আলিআঁ, ঘর খাদা সালিআঁ।

(৮২২) সসুরাল কা কৌআ—জমাঈ বোলে বাহ্ বাহ্।

(৮২৩) জীজা তো খুশ—সালা করে ভলাঈ,
য়ে না দেখে খাএ কিতনী মলাঈ।

(৮২৪) মামনকু মচ্চান মৈলা পাসম্ মচ্চানকু মামন পনন্তু মৈলে পাসম্।

(৮২৫) বায়কোচা ভাউ নি লোণ্যাহূন মউ।

(৮২৬) বহনোঈ কো হুঈ খাঁসী, সালা সোচে হুঈ ফাঁসী।

(৮২৭) ভাঈ সে ভী মীঠা পায়া সালা, তেরা শুক্র্ হৈ উপরবালা।

(৮২৮) মেনমাম কোড়কু বাবমরিদি কূড়া অঈতে তমুড়িকন্না প্রিয়ং।

(৮২৯) কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা,
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।

(৮৩০) বতব্ অন্দরু টোঠ্ ক্যাহ জি তহার্, হোহ্বর্য়ব্ অন্দরু টোঠ্ ক্যাহ্ জি হহার্।

(৮৩১) বডডু ধনমিচ্চিনা বাবমরদি লেনি চুট্টরিক্ক চেয়রাদু।

(৮৩২) সালা শীংহঁনি খে বি প্যারা আহিনি।

(৮৩৩) সোয়র‍্যান্ত সালা হত্যারান্ত ভালা।

(৮৩৪) মচ্চানৈপ্ পারক্ক উখুম্ ইল্লে, ময়িরৈপ্ পারক্ক করুপ্পুম্ ইল্লৈ।

(৮৩৫) আলা বায়কোচা ভাউ য়াহো আপণ একা তাটী জেবূ।

(৮৩৬) ভারিজা লাগি সানাশলাকু দণ্ডবৎ।

(৮৩৭) মলৈ এরিনালুম্ মৈত্তননৈক কৈ বিডাদে।

(৮৩৭) সালে নে বহনোঈ কো দী সলা—গোমাংস খানে সে হোতা হৈ ভলা।

(৮৩৮) ঠাকরাঁ, কী টাবর টুবর হৈ, কৈ ভাঈ রে সালে রে দো টাবরকা হৈ।

(৮৩৯) বাবমরিদি ব্রতক কোরুনু, দায়াদি চাব গোরুনু।

(৮৪০) গন্নে তোঁ গডেরী মিঠ্ঠী, গুড় তোঁ মিঠ্ঠা লালা;
পুত্তর নালোঁ জঁবাঈ মিঠ্ঠা, ভাঈয়োঁ মিঠ্ঠা সালা।

(৮৪১) কণুকরুম্ব নিক্কিম্ মচ্চান কড়সন্ত কিট্টু উন্ননক্কু এদরা সদিত্তিট্টম্ পোট্টান।

(৮৪২) সালে নূঁ দিত্তে তে দরিয়া বিচ সুট্টে।

(৮৪৩) কালা এটলা ভূতনা সালা নহীঁ।

(৮৪৪) অনদেখা চোর সালে বরাবর।

(৮৪৫) অনদেখা চোর বাপ বরাবর।

(৮৪৬) কালা, কালা, কিসনজীরা সালা।

(৮৪৭) বহূ কনাঙ্গ্ চোর মরাবৈ চোর বহূরা ভাঈ।

(৮৪৮) কর্জ কাঢ়ি কে কর্জ লগাবে টট্টী কে ঘর তালা,
সালা কে সঙ্গ্ বহিন পঠাবে তীন্ কে মুঁহ কালা।

(৮৪৯) তালী বিন কৈসা তালা, জোরূ বিন কৈসা সালা?

(৮৫০) বহনোঈ কা ক্যা কহনা, ভরোসা হৈ বস্ বহনা।

(৮৫১) অক্কাড় উখুম্ মচ্চান্ পগৈয়ুমা?

(৮৫২) বহনোঈ লগাএ গলে, বহন তো নাম সে জলে।

(৮৫৩) অলুচুক্ কোলুত্তু অক্কাড়গৈ পোনাল্, অক্কাড় ইডুত্তু মচ্চানিডত্তিল্ বিট্টাড়াম্।

(৮৫৪) অক্কি কোট্টু অক্কন মনেয়ে?

(৮৫৫) অরিকোটুত্তাল্ পেণ্ডড় ব্বীট্টিল্ পোকণো?

(৮৫৬) অক্কাড় ইরুক্কিখরৈয়িল্ মচ্চান্ উখু।

(৮৫৭) চোরে চোরে আলি—এক চোরে বিয়ে করে আরেক চোরর শালি।

(৮৫৮) পকবান্নাত লাড়ূ আণি গোতান্ত সাড়ূ।

(৮৫৯) জমণমাঁ লাড়ূ নৈ সগপণমাঁ সাড়ূ।

(৮৬০) জেরণান্ত লাড়ূ, পংক্তীলা সাড়ূ।

(৮৬১) সোয়র‍্যাত সাড়ূ, হত্যারাত মাড়ূ, ভোজনাত লাড়ূ।

(৮৬২) খায় ঘড়ী সাঢ়ূ, "মায় ঘড়ী বাঢ়ূ।

(৮৬৩) ভাঈ কো ছোড় সাঢ়ূ কে ঘর উসকা হৈ আনা-জানা,
বনকে কবুতর চুগনা হৈ জো বহাঁ দানা।

(৮৬৪) ভৌজী কী বহন জো আঈ, সগে ভাঈ কো সাঢ়ূ বনাঈ।

(৮৬৫) সসু রে ন সান্থরা, সালী অ রে ন নীঁছুঁ।
চণ্ড রে ন রাতি ড়ী, সিজ রে ন ডীঁহুঁ।

(৮৬৬) মাছ জাকরে ফলী, টাপরা জাকরে শালী।

(৮৬৭) টাপরা জেবে করি বসিব পাখরে থিব শালী।

(৮৬৮) বাহ্ রী হমারী সালী, তূ হৈ ফূলোঁ কী ডালী।

(৮৬৯) কল কিসী কো কহেগী তূ পিয়া, সোচতে হী ধড়কে মোরা জিয়া।

(৮৭০) তুঝে অগর দেখতে পহলে সচ কহতে হৈঁ সালী,
তেরী বহন সালী হোতী, তূ হোতী ঘরবালী।

(৮৭১) শাদী হমনে কী থী জব তূ থী একদম ছোটী,
তূ হী বনতী বীবী অগর পহলে জন্মী হোতী।

(৮৭২) গুস্সেবালী সালী নে কিয়া ঐসা হাল,
দো হী দিন মেঁ জীজা নে ছোড়া সসুরাল।

(৮৭৩) অক্ক নম্নবড়াদরে ভাব নম্নবনে?

(৮৭৪) এম্নি ভাব অন্দরূ বদনেকায়ি তোটদম্নি ভাব অম্নবেড।

(৮৭৫) এক্কডয়িনা বাবা অনুগানি বঙ্গতোট বন্দ বাবা অনকু।

(৮৭৬) সকাল গাধুআ পখাল খিআ দিহরে জেবে জাএ,
শালি সাঙ্গরে হাস পারিহাস কহিলে জেবে সহে।

(৮৭৭) আঁখো কা নূর হৈ সালী, কিরকিরী ঘরবালী।

(৮৭৮) তেরে লিএ ঐ সালী, মুঝে কবুল হৈ গালী।

(৮৭৯) সালী আধী নিহালী, সলহজ পুরী জোয়।

(৮৮০) ঠাকুরজামাই চাকরি কামাই মাসে দুদিন এসো,
ঠাকুরঝিকে যেমন-তেমন আমায় ভালোবেসো।

(৮৮১) সালা-সাঢ়ূ না আএ কাম সালী-সলহজ চুকাএ দাম।

(৮৮২) হৈ জো সাঢ়ূ কী সালী, বীবী কে হাথ মেঁ বালী।

(৮৮৩) মুঝে দেতা হৈ গালী, পর দেবী হৈঁ সলহজ-সালী।

(৮৮৪) মোগুডু লেকপোতে অপ্পমোগুডু কূর লেকপোতে পপ্পুকূর ।

(৮৮৫) তিক্ক পিল্ল তীর্থ অক্কমোগনি রেণ্টবেট্রুকু পোয়িন্দট।

(৮৮৬) আরশে ভাঈনী বহেন, তে জশে আঁসু ঝরী,
আরশে বাঈনী বহেন, তে জশে সাড়ী পেহরী।

(৮৮৭) পহেলুঁ তীর্থ সাসু-সসরো, বীজুঁ তীর্থ সালী,
ঠীকঠাক মাত-পিতা, শ্রেষ্ঠ তীর্থ ঘরবালী।

(৮৮৮) তাকন তরকন কোনপইস দঁতাচিআর, চার তরহ কে রিশতেদার।

(৮৮৯) সাত ফেরোঁ সে ফরক—জীবন বনা নরক।
